জিহাদ প্রসঙ্গে

মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহর বয়ান

এবং

কিছু অভিব্যক্তি

সর্বশেষ সম্পাদিত

২৭ শে রমজান , ১৪৪৩ হিজরী।

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

এক. কয়েকদিন হলো মাদানীনগর মাদ্রাসায় আমাদের দেশের বরেণ্য আলেম মুহতারাম

আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ তালিবুল ইলমদের সামনে দু’টি বয়ানে কিছু নসীহা ও রাহনুমায়ীমূলক কথা বলেছেন। হুজুরের প্রতিটি বয়ানেই শিখার মতো অনেক ইলমী উসূলী বিষয় থাকে, যেগুলো প্রত্যেক আলেম ও তালিবুল ইলমের জন্য জরুরী। আল্লাহ তাআলা হুজুরের নেক হায়াত বাড়িয়ে দিন। উলামা তলাবাদের মাথার উপর এ রহমতের ছায়া আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ করুন। আমীন।
আমি প্রথমে আল্লাহ তাআলার এবং তারপর মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে নিচ্ছি যে, আমাদের দেশে ইলমী অঙ্গনে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ইলমের যে সহীহ তরিকা তিনি উলামা তলাবাদের সামনে পেশ করেছেন, বলতে গেলে এ দেশে এটি তাজদিদি কাজ। আল্লাহ তাআলা হুজুরের কাজগুলো কবুল করে নিন।
দুই. মাদানীনগরের বয়ানে হুজুর ইলমের ময়দানের অনেকগুলো জরুরী উসূল তালিবুল ইলমদের সামনে পেশ করেছেন, যেগুলো সব আলেম-তালিবুল ইলমের আজীবন মেনে চলা দরকার। যেমন: মাসতুর, মালহুজ, মাহজুফ, মুকাদ্দার, মুস্তাসনা- সব সহ বোঝা; ইলম হজম করা; হিকমাহ ও তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন অর্জন করা; কিতাবি

ইস্তি’দাদের পাশাপাশি ইলমি ইস্তি’দাদ অর্জন করা; প্রত্যেক ফনের মৌলিক কিতাবগুলো আগাগোড়া বাসিরতের সাথে অধ্যয়ন করা; প্রত্যেক ফনের মাসআলা ঐ ফনের ফুকাহাদের থেকে হল করা; উস্তাদের সোহবত ইখতিয়ার করা; উস্তাদ থেকে নিজেকে মুস্তাগনি মনে না করা; নিজেকে যি-রায় মনে না করা, তাহকিকের ময়দানে ফায়েয মনে না করা; সালাফে সালিহীনের সিরাত অধ্যয়ন … ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমলের তাওফিক দান করুন। আমীন।
তিন. আলোচনা প্রসঙ্গে হুজুর জিহাদ ও মুজাহিদদের ব্যাপারে, খিলাফাহ ও সিয়াতের ব্যাপারে বেশ কিছু কথা বলেছেন। যতটুকু বুঝতে পারছি: মনে হয় কিছু জযবাতি অপরিপক্ক লোকের দ্বারা হুজুর কষ্ট পেয়েছেন। ফলে কথাগুলো হুজুর বলতে বাধ্য হয়েছেন।
আসলে অনেক ভাই-ই আছেন, যারা টুকটাক কিছু বুঝতে না বুঝতেই অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কেউ তাতে দ্বিমত করলে মেনে নিতে পারেন না। উজর কবুল করেন না। বরং অনেক শুরুত কুয়ুদ ছাড়াই তিনি অসম্পূর্ণভাবে বুঝেছেন, ফলে এক রকম অজ্ঞতাপ্রসূত উগ্রতা তার মাঝে কাজ করে। এ ধরনের ভাইদের ফলে কাজের ময়দানে বেশ ক্ষতি হয়ে যায়। আল্লাহ

তাআলা আমাদের সবাইকে মাফ করুন। হুজুরের ক্ষেত্রেও হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকবে। ওয়াল্লাহু আ’লাম।
তবে হুজুর ভরা মজলিসে আমভাবে আলোচনাটা যেভাবে করেছেন, তাতে বর্তমানে জিহাদি চেতনা লালনকারী বা জিহাদি কাজের সাথে সম্পৃক্ত অনেক তায়েফাই প্রশ্নবিদ্ধ হন। বিশেষত হুজুর যখন বয়ানে নিজেই বলেছেন, বিশেষ কোনো ব্যক্তির সমালোচনা হুজুরের উদ্দেশ্য না।
চার. আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, হুজুর যে ধরনের নজরিয়ার নকদ করেছেন, অনেক লোকই সে নজরিয়ার আওতায় পড়ে। এবং এটা শুধু জিহাদের ক্ষেত্রেই নয়, ফিতনা আর অধঃপতনের এ যামানায় ইলমের প্রত্যেকটা অঙ্গনেই এখন এ ফিতনা দেখা যাচ্ছে এবং বেশ ব্যাপকভাবেই দেখা যাচ্ছে। তবে হুজুরের আলোচনার কেন্দ্র ছিল জিহাদ, জিহাদিরা। ফলে জিহাদি কাফেলার ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিছু কথা লিখতে হচ্ছে।
পাঁচ. এ কথাগুলো আমি কোনো জিহাদি কাফেলার প্রতিনিধি হিসেবে বলছি না, এগুলো আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি। আমার কথায় কোনো ভুল হলে সেটা আমার নিজের উপরেই

বর্তাবে, মুজাহিদ কাফেলার উপর নয়। একজনের ভুলের দায়ভার আমরা ইনশাআল্লাহ আরেকজনের উপর চাপাবো না।
ছয়. আমি শুরুতেই বলেছি, আজীবন মেনে চলার মতো অনেক জরুরী কথাই হুজুর পেশ করেছেন। সেগুলোতে আল্লাহ তাআলা আমাকেও আমল করার তাওফিক দান করুন। তবে জিহাদ ও জিহাদি কাফেলার ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু পয়েন্টে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।
সাত. একটি সামগ্রিক অভিব্যক্তি
এর আগেও হুজুরসহ মারকাযের কিছু লেখা ও বয়ানে জিহাদের ব্যাপারে চলমান ফিতনা নিয়ে কথা এসেছে। তবে বরাবরই যে একটা শূন্যতা অনুভব করি:
* কথায় অনেক বেশি ইজমাল-অস্পষ্টতা থেকে যায়।
* কাদের রদ করা হচ্ছে?
* যাদের রদ করা হচ্ছে তাদের কোন কোন্ বিষয়টার রদ করা হচ্ছে?
* যাদের রদ করা হচ্ছে তাদের দলীল কি?
* এর বিপরীতে হুজুর বা মারকাযের মতটা কি?
* সে মতের দলীল কি?

* যাদের রদ করা হচ্ছে তাদের দলীলের জওয়াব কি?
* এ ফিতনার বিপরীতে হাল যামানায় শরীয়তের সহীহ তরিকাটা কি? –এসবের কোনো কিছুই স্পষ্ট করা হয় না। ফলে একটা ধোঁয়াশার ভেতর থাকতে হয় সর্বদা।
যেমন এবারের বক্তব্যেও
* ‘সাহাবি বিদ্বেষী লোক’;
* ‘গাইরে আলেম মুজাহিদ’;
* ‘কট্টরপন্থী সালাফী’;
* ‘ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-ব্যবসায়ী’;
-এদের থেকে নতুন নতুন মাসআলা নিয়ে জিহাদ-খেলাফত-সিয়াসতের সহীহ মাফহুমের ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে হুজুর দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু এখানে অনেক বেশি ইজমাল রয়ে গেছে:
* ‘সাহাবি বিদ্বেষী’, ‘গাইরে আলেম মুজাহিদ’, ‘কট্টরপন্থী সালাফী’ ‘ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-ব্যবসায়ী’ এসব লোক কারা?
* এদের থেকে কি কি নতুন আবিষ্কৃত মাসআলা নেয়া হচ্ছে?

* তারা জিহাদের নতুন কি মাফহুম পেশ করছে যা সালাফের যামনায় ছিল না এবং আইম্মায়ে কেরাম বলেননি ?

* এসব নতুন আবিষ্কৃত নজরিয়া ও মাসআলার পক্ষে তারা কি কি দলীল পেশ করছে ?

* এর বিপরীতে জিহাদ , খেলাফত ও সিয়াসতের ব্যাপারে ইসলামের সহীহ -সঠিক অবস্থানটি কি এবং এ ব্যাপারে হুজুর ও মারযকাযের রায় কি ?

* এ সহীহ সঠিক অবস্থানের দলীল কি ?

* ভ্রান্তদের দলীলের খণ্ডন কি ?

এ ধরনের অসংখ্য বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। ফলে পাঠক ও শ্রোতারা জিহাদের ব্যাপারে একটা শঙ্কা ও ভীতির সম্মুখীন হচ্ছেন , কিন্তু সঠিক রাহনুমায়ী পাচ্ছেন না। এতে করে আল্লাহ তাআলার ফরযকৃত পবিত্র জিহাদের ব্যাপারে মানুষ জেনে না জেনে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। ‘না -জানি গোমরাহির কবলে পড়ে গেলাম ’ এমন এক অজানা শঙ্কায় জিহাদের রাস্তা থেকে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অথচ একজন রাহনুমা আলেমের দায়িত্ব হচ্ছে যেমনটা আল্লাহ তাআলা তার নবীকে আদেশ দিয়েছেন ,

{ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]

হে নবী, আপনি মুমিনগণকে কিতালে উৎসাহিত“ করুন।” -আনফাল: ৬৫ জিহাদে প্রচলিত ভুলগুলোর এমনভাবে সমালোচনা কাম্য নয়, যার কারণে মানুষ জিহাদমুখী না হয়ে বরং জিহাদবিমুখ হয়ে পড়ে। এটি শুধু জিহাদের বেলায়ই নয়, দ্বীনের প্রতিটি ফরযের বেলায়ই এ বিধান। যেমন বর্তমান কাওমি মাদ্রাসাগুলোতে সমালোচনাযোগ্য অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সেগুলোর সমালোচনা এমনভাবে কাম্য নয় যে, মানুষ কাওমি মাদ্রাসা থেকে আরও দূরে সরে যাবে।

***

প্রথম বয়ান, কাবলাল মাগরিব, ৩২ মিনিট

বক্তব্য ০১ (সারমর্ম; হুবহু নস নয়): [আকল-ফাহম-বাসিরাত-তাফাক্কুহ ফিদদিনের অভাবের কারণে এবং মাসতুরের সাথে সাথে মালহুজটাও না বুঝার কারণে তালিবুল ইলমরা এখন যেকোনো নতুনের পিছনে দৌড়াচ্ছে। কোনো রেসালায়, কোনো কিতাবে, কোনো বয়ানে নিজেদের তবিয়তের সাথে, মেজাযের সাথে মিলে এমন কোনো দাওয়াত পেয়েছে; ব্যস সেটাকেই হরফে আখের মনে করছে।

নিজের উস্তাদের কাছে এরকম কিছু শুনে না, তো মনে করে উনারা গাফেল।]
অভিব্যক্তি
হুজুরের পরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, এখানে দাওয়াত বলতে জিহাদের দাওয়াত উদ্দেশ্য। কিংবা ব্যাপক উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে, জিহাদের দাওয়াতটা বিশেষভাবে উদ্দেশ্য। মোটকথা, জিহাদের ব্যাপারে দুয়েকটা কিতাব-রিসালা বা বয়ান শুনেই তালিবুল ইলমরা এগুলোকে বিশ্বাস করে বসছে। সত্যাসত্য যাচাই না করেই এগুলোর পেছনে ছুটছে। শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত না, নিজেদের উস্তাদদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। জিহাদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা উস্তাদরা না বলায় উস্তাদদেরকে গাফেল মনে করছে।
* মেনে নিতে হবে যে, কিছু তালিবুল ইলম বাস্তবেই এমন আছে। কিন্তু সকলেই এমন নয়। আমরা দেখছি ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া যি- ইস্তি’দাদ তালিবুল ইলম (বরং অনেক উস্তাদও আলহামদুলিল্লাহ) জিহাদে জড়াচ্ছে। অথচ জিহাদের রাস্তা যে রক্তমাখা-কাটাভরা সেটা তারা জানে। যেকোনো সময় গ্রেফতার হতে পারে, জীবনের স্বপ্ন সব ধুলোয় মিশে যেতে পারে জেনেও জড়াচ্ছে। জিহাদে জড়ানো এ ধরনের উস্তাদ ও তালিবুল ইলমের সংখ্যা

আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট এবং দিন দিন বাড়ছে। তাদের ব্যাপারেও কি বলা যায়, দুয়েকটা রিসালা আর বয়ানেই ……? বরং অনেকে আছেন যারা দীর্ঘদিন যাচাই বাছাই এবং গভীর অধ্যয়নের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; যেমন শিক্ষিত একজন ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তি দীর্ঘদিন গবেষণা শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন।
* উস্তাদদের গাফেল মনে করার কথা যদি বলি, ঢালাওভাবে উস্তাদদের গাফেল মনে করে যে তা না। অনেক উস্তাদই সচেতন আছেন। বরং অনেকে তো উস্তাদের দাওয়াতেই জিহাদে জড়ায়।
* জিহাদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা ইলমি অন্যান্য অঙ্গন এবং যুগের অন্যান্য চাহিদাগুলোর কথা ধরি। সেগুলোর ক্ষেত্রে কি সব উস্তাদ সচেতন? তাহলে জিহাদের মতো বিধান (যা বৈশ্বিকভাবে যুগ যুগ ধরে প্রোপাগাণ্ডার শিকার, যেখানে ধরা পড়লে নির্যাতনের শিকার হওয়া সুনিশ্চিত এবং যেটা কুরআনের ভাষ্য মতেই কঠিন বিধান) – এ ব্যাপারে কি অনেক উস্তাদ গাফেল থাকতে পারেন না? যেখানে সাধারণ যুগ সমস্যার ব্যাপারেই শতকরা দুইজন আলেম সচেতন পাওয়া মুশকিল, সেখানে জিহাদের ব্যাপারে অনেক উস্তাদ গাফেল থাকা আজিব গরিব কিছু নয়।

* একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখি: যখন এদেশে প্রথম মারকাযুদ দাওয়াহয় উলুমে হাদিসের চর্চা শুরু হলো, তখন এদেশের আলেমদের এক বিশাল অংশ একে খুব একটা ভাল নজরে দেখতে পারলো না।
উলুমে হাদিস আবার কি?
কই, আমরা তো উলুমে হাদিস পড়িনি, আমরা কি দ্বীনের খেদমত করছি না?
হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারি লেখার পর উলুমে হাদিসের আর কি পড়ার আছে?
সনদ দিয়ে আমরা কি করি, আমাদের দরকার মতন?
– ইত্যাদি অজ্ঞতাসূলভ অনেক আজিব গরিব কথা শুনা গেছে, যেগুলো শুনে একজন সচেতন আলেম লা হাওলা-ইন্না লিল্লাহ পড়া ছাড়া কিছু করার নেই। তো উলুমে হাদিসের মতো ইলমের একটা এমন অনিবার্য প্রযোজ্য শাখার ব্যাপারেই যদি আলেমদের বিশাল কাফেলার এ রকম হীনমন্য মানসিকতা হয়, তখন আশ্চর্যের কি আছে যে, এর চেয়েও বেশি সংখ্যক আলেম জিহাদ, সিয়াসত, খিলাফতের মতো নাজুক, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রোপাগাণ্ডার শিকার বিধানের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে গাফেল থাকবেন?
* অধিকন্তু গাফেল মনে করার সিলসিলা প্রথম দিন থেকে শুরু হয় না। কওমি তলাবারা

উস্তাদ ভক্ত। উস্তাদের কথায় উঠে বসে।
উস্তাদের পা ধুয়ে দেয়াকে সৌভাগ্য মনে করে।
উস্তাদের বাজার করে দেয়া, উস্তাদের ক্ষেতে কাজ করে দেয়া সৌভাগ্যের সোপান মনে করে।
এভাবে একটা নয় দু’ইটা নয়; পাঁচ-দশ-বিশ বছর পর্যন্ত উস্তাদের সোহবতে কেটে যায়।
কথায় আছে: ‘সাহিবুল বাইতি আদরা বিমা ফিহি’- ‘ঘরের খবর ঘরের লোকই ভাল জানে’। এ দশ বছর সোহবতে কোনো দিন আমার উস্তাদের মুখে শুনিনি হারানো খেলাফতের স্মৃতি কথা। শুনিনি কাশ্মিরি মা বোনোর আহাজারির কথা। শুনিনি আফগান ইরাক সিরিয়ার শিশুদের না খেয়ে মরার করুণ কাহিনি। শুনিনি আল্লাহর শাসন আর কুফরি শাসনের ব্যবধানের কথা। বরং শুনেছি রফয়ে ইয়াদাইন-আমীন বিল জাহর। শাদ্দে রিহালের মাসআলায় ইবনে তাইমিয়াকে এক হাত দেখে নেয়া।
যারা আরেকটু সচেতন তারা বলেছেন, তালেবান আমেরিকার তৈরি। উসামা বিন লাদেন আমেরিকার দালাল। মোল্লা উমর ইসলামের ক্ষতি করেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। শাতেমে রাসূলদের হত্যাকারীদের মাথায় শয়তান চেপেছে।
যারা আরও সচেতন তারা বলেছেন, জিহাদের জন্য ইমাম লাগবে- কিতাবে আছে, আমাদের ইমাম

নাই। আকাবিরদের তাজরেবার দ্বারা সাবেত হয়েছে জিহাদের দ্বারা কাজ হয় না। আরাকানিরা আল্লাহর গজবে পড়েছে। আইএস মুসলিমদের তাকফির করে, তাদেরকে তো আমেরিকা মারবেই।
শুনেছি সুফিয়ানে কেরাম হলেন প্রকৃত মুজাহিদ। শুনেছি নির্বাচনের জিহাদের কথা ... ইত্যাদি ইত্যাদি।
তখন আমি কিভাবে বলতে পারি, তিনি যুগ সচেতন?
* হুজুর বলেছেন, দুয়েকটা কিতাব রিসালা আর বয়ান শুনেই পেছনে ছুটছে তালিবুল ইলমরা। এখানেও সেই আগের কথাটা বলতে হয়, ‘সাহিবুল বাইতি আদরা বিমা ফিহি’। আমি দশ বছরের সোহবতে ভাল করেই জানতে পেরেছি আমার উস্তাদ কতটুকু যুগ সচেতন। আমি এও দেখেছি, অনেক কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে পড়ানোর কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমার প্রিয় উস্তাদের কিতাব কেটে দিয়েছে। জিহাদের পক্ষে বলার কারণে দফতরে ডেকে নিয়ে শাসানো হয়েছে। বেশি না বুঝতে সতর্ক করা হয়েছে। আমি দেখেছি কিভাবে চামড়া কালেকশানের মতো গাইরতহীন কাজটিকে আকাবিরের দোহাই দিয়ে গৌরবের কাজ বানানো হয়েছে। আমার দীর্ঘ সোহবতে আমি সব হাকিকত জানি।

অপরদিকে প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছি কি হচ্ছে ইরাকে আফগানে। নাফ নদীতে কিভাবে ভেসে আসছে রোহিঙ্গাদের লাশ। আর আমার উস্তাদ কিভাবে জনসম্মুখে ফতোয়া দিচ্ছেন, জিহাদ করা হারাম, ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকাহ। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে উস্তাদের ফতোয়া আরও ক্ষরণ বাড়িয়ে দিল।
জিহাদ মুমিনের ফিতরতের তাকাজা। আমার মা বোনের আহাজরি শুনে আমি কি করবো? জিহাদ হারাম? ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকাহ? অথচ এমন হালে জিহাদ ফরযে আইন কিতাবাদিতে লিখা আছে। আমার ফিতরত তো আল্লাহর ফরযকৃত এ বিধানটির জন্য আল্লাহর রহমতে তৈয়ার হয়েই ছিল। আমার উস্তাদের এমনসব বক্তব্য এতদিন জিহাদের পথে আড়াল হয়ে ছিল। আজ যখন একটা বয়ান শুনলাম, একটা রিসালা পড়লাম- এটা নতুন কোনো কিছু নয়, সত্যের সামনে যে কৃত্রিম পর্দাটা ছিল সেটা শুধু সরে গেল। দশ বছর পর হারানো ভাইয়ের সাথে দেখা হলে যেমন ভাইকে চেনা যায়, জিহাদের বিধানটির সাথে দশ বছর পর এভাবেই আমার দেখা হল। এটি শুধু একটি রিসালা বা একটি বয়ানের প্রভাব নয়, এটি ফিতরত আর শাশ্বত সত্যের প্রভাব।
* অধিকন্তু একটা রিসালা পড়েই বা একটা বয়ান শুনেই পিছনে ছুটছে বিষয়টা এমন না।

যারা জিহাদে জড়িত তারা উস্তাদের অজান্তে হয়তো দীর্ঘদিন থেকেই জড়িত কিংবা অন্তত মানসিকতা পোষণ করে আসছে। এ দীর্ঘদিন সে জিহাদ নিয়ে পড়াশুনা করে আসছে। ময়দানের ভিডিও ও নুসরতের দৃশ্যগুলো দেখে আসছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি তাকে মুগ্ধ করে আসছে। পাশাপাশি এ দীর্ঘদিন যাবতই সে তার উস্তাদের যুগ-সচেতনতার মাত্রা (!!) দেখে আসছিল আর মনে মনে দুঃখ করছিল। আফসোস করছিল। হয়তো কোনো কারণবশত আজ উস্তাদের সামনে প্রকাশ পেলো সে জিহাদি। সে মানহাজি। সে জযবাতি।
যামানা এখন আপডেট। প্রতিদিনের জিহাদের আপডেট চলে আসে তালিবুল ইলমের হাতে। মুজাহিদদের বিজয়ে উস্তাদের অগোচরেই তালিবুল ইলমরা মিষ্টি খাওয়ার আয়োজন করে। অতএব, তালিবুল ইলমরা এক দিনেই, একটা রিসালা পড়েই, একটা বয়ান শুনেই যে পিছনে ছুটেছে তা নয়। বিশ্ব নবীর এক মজলিসের দাওয়াতেই বাপ দাদার ধর্ম সাহাবারা কেন ছেড়েছিল? শুধু এক মজলিসের দাওয়াত নয়, শাশ্বত সত্য আর ফিতরত।

***

বক্তব্য ০২ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [ব্যাপকভাবে এটা ভাবা শুরু হচ্ছে যে, সবাই

গাফেল। আকাবেররা গাফেল। হযরত থানবি, হযরত মাদানী, আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, শাব্বির আহমাদ উসমানী পুরা আকাবেরে দেওবন্দ- সবাই এটা থেকে গাফেল, যেটা উনারা এখন আবিষ্কার করেছেন।]
অভিব্যক্তি
এখানেও সেই আগের প্রশ্নগুলো:
* নতুন আবিষ্কৃত সে জিনসটি কি?
* এ জিনিসটি কে আবিষ্কার করেছে?
* গোটা আকাবেরে দেওবন্দ সবাই সে নতুন আবিষ্কৃত জিনিসটি থেকে গাফেল: এটা কে বলেছে?
* যে বলেছে সে কি আসলে কোনো হক জিহাদি কাফেলায় জড়িত এবং জড়িত থাকলে এটা কি সে কাফেলার মতাদর্শ, না’কি ব্যক্তি বিশেষের বিচ্যুতি?
আমার জানামতে মুজাহিদিনে কেরাম নতুন কোনো দাওয়াত নিয়ে আসেননি। কুরআন সুন্নাহ সাহাবা সালাফের যে দাওয়াত যামানার আবর্তনে চাপা পড়েছিল, মুজাহিদিনে কেরাম শুধু তা যিন্দা করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। আর যামানার আবর্তনে যে শরীয়তের অনেক বিধানই চাপা পড়ে গেছে তা তো স্বীকৃত। স্বয়ং

মারকাযুদ দাওয়ার প্রতিষ্ঠাও তো চাপা পড়া ইলমকে যিন্দা করার জন্যই।
আর আকাবিরদের কথা যদি বলি, তো ঢালাওভাবে আকাবিরদের গাফেল বলেন- মুজাহিদদের এমন কাউকে এখনও দেখিনি। অতি জযবায় বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মাসআলায় অপরিপক্ক কেউ বলে থাকলে থাকতে পারে। নতুবা মুজাহিদিনে কেরামই বলতে গেলে আকাবিরদের যোগ্য অনুসারি। মুজাহিদগণ আকাবিরদের নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার চেয়ে আকাবিরদের অনুসরণ করে চলাকেই বেশি ভালবাসেন। এজন্যই তো মুজাহিদদের:
কেউ সায়্যিদ আহমাদ বেরেলবির মতো শহীদ।
কেউ শায়খুল হিন্দের মতো নির্বাসিত।
কেউ মুহাজিরে মক্কির মতো দেশ ছাড়া।
কেউ গাঙ্গুহির মতো আদালতের কাঠগড়ায়।
কেউ মাদানীর মতো যিন্দানখানায়।
কেউ নানুতুবির মতো পলাতক।
কেউ ইসমাইল শহীদের মতো ভ্রান্ত আখ্যায়িত।
পক্ষান্তরে যারা আকাবিরের দোহাই দিয়ে চলেছেন, তারা তাগুতের প্রিয়ভাজন হয়ে বহাল তবিয়তে জীবন যাপন করছেন।

***

বক্তব্য ০৩ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [এটা সম্ভব যে, জুমহুর একটা বলবেন তা ভুল আর অল্পসংখ্যক যা বলবেন সেটা সহীহ। কিন্তু সবাই এক দিকে আর দুয়েকজন একদিকে আর দুয়েক জনেরটাই সঠিক সবারটা ভুল- এটা হতে পারে না।]
অভিব্যক্তি
এ উসূল শুধু জিহাদ-সিয়াসাত-খিলাফতের ব্যাপারেই নয়, দ্বীনের যেকোনো বিধানের ব্যাপারেই এটি প্রযোজ্য।
হয়তো বলবেন, জিহাদিরাই এমনসব শায মাসআলা বলে, তাই অভিযোগ তাদের উপর। যদি এমনটাই হয়, তাহলে এমন দু’চারটা মাসআলা পেশ করার অনুরোধ, যেগুলোতে গোটা উম্মাহ একদিকে আর শুধু দুয়েকজন একদিকে। তবে অনুরোধ থাকবে, শুধু বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ থাকবো না, গোটা মুসিলম উম্মাহ এবং সবখানের মু’তাবার উলামাদের সামনে রাখবো। উল্লেখ্য, দুয়েকজন বলতে কি উদ্দেশ্য হুজুর তা খুব একটা স্পষ্ট করেননি। নতুবা এমন কিছু মাসআলা আছে, যেখানে সাহেবাইনসহ জুমহুরে উম্মত একদিকে আর আবু হানিফা একদিকে, অথচ মাযহাবের ফতোয়া আবু হানিফার রায়ের উপর। কোনো মুজতাহিদ কোনো রায় পেশ

করার পর যখন উম্মাহর এক মু’তাদবিহি অংশ সেটা গ্রহণ করেছে, তখন তাকে তাফাররুদ বলে প্রত্যাখান বা সমালোচনা করার সুযোগ নেই। এ ধরনের মাসআলা অবশ্যই হুজুরের উদ্দেশ্য না।

***

বক্তব্য ০৪ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [শুধু দলীল উল্লেখ করলে হবে না, ওয়াজহে ইস্তিদলালও লাগবে (অর্থাৎ দলীল থেকে উসূলের আলোকে মাসআলাটি কিভাবে সাব্যস্ত হচ্ছে)। অধিকন্তু মুজতাহাদ ফিহি মাসআলায় ওয়াজহে ইস্তিদলালসহ দলীল উল্লেখ করা হলেও কথা শেষ হয়ে যাবে না (এবং কাতয়ি ফায়সালা হয়ে যাবে না যে, এটাই চূড়ান্ত এবং বিপরীত বলার সুযোগ নেই।) তাহলে কেন বল, দলীল উল্লেখ থাকলেই সেরে যাবে।]
অভিব্যক্তি
কথা সত্য যে, শুধু কুরআনের একটা আয়াত বা একটা হাদিস তুলে দিলেই হবে না, আয়াত হাদিস থেকে মাসআলাটি কিভাবে প্রমাণ হচ্ছে তাও উসূলের আলোকে দেখাতে হবে।
আর মাসআলা যদি মতভেদপূর্ণ হয়, তাহলে দলীল দিয়ে প্রমাণ করলেও তা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। কারণ, যেখানে কয়েক রকমের মত আছে, সেখানে আমি যেটা গ্রহণ করেছি, আরেকজন

সেটা গ্রহণ নাও করতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আমারটা জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায়। তবে এখানে কথা আছে:
* মুজাহিদরা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিলে যেমন অন্যায়, মুজাহিদরা গ্রহণযোগ্য উলামাদের মতের উপর ভিত্তি করে একটা গ্রহণ করে নেয়ার পর তাদের সমালোচনা করাও অন্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এ উসূল আমরা মুজাহিদদের বেলায় রক্ষা করি না। বরং কোনো দিক থেকে একটু সুযোগ পেলেই অনেকে মুজাহিদদের সমালোচনা করে।
* হুজুর স্পষ্ট করেননি, মুজাহিদিনে কেরাম কোন্ মুজতাহাদ ফিহি মাসআলাটি উম্মাহর উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। যদি হুজুর সুনির্দিষ্ট করে কোনো মাসআলা দেখান, তাহলে হয়তো মুজাহিদিনে কেরাম সে মাসআলার ব্যাপারে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। হুজুর হয়তো তাগুতরা মুরতাদ কি’না এবং বর্তমান তাগুতশাসিত মানবরচিত কুফরি আইন দ্বারা পরিচালিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলো দারুল হারব কি’না- এ দু’টি মাসআলা পেশ করবেন। সামনে হুজুরের বক্তব্যে যখন আসবে, তখন এ ব্যাপারে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। এখানে এতটুকু বলে রাখি যে, (হুজুরের দৃষ্টিতে) মাসআলা দু’টি মুজতাহাদ ফিহ বা মুখতালাফ

ফিহ হলে মুজাহিদিনে কেরামের সমালোচনা জায়েয হবে না। নিজেদের মতামত মুজাহিদিনে কেরামের উপর চাপিয়ে দিতে চাওয়া বৈধ হবে না।
* জযবাতি কেউ যদি কোনো মুজতাহাদ ফিহি মাসআলা হুজুরের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, সেটা সে জযবাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, কাফেলার উপর চাপানো যাবে না। বর্তমান কাওমি মাদ্রাসার অনেক বক্তা বহু রকমের গলদ কথা বলে যাচ্ছেন। তার দায় গোটা কাওমি জগতের উপর চাপানো যাবে না। জিহাদের ব্যাপারেও বিষয়টা এমন হওয়া উচিত।
* আর দলীলের প্রসঙ্গ যদি টানি, হুজুর হয়তো নিজের মুসতাওয়া (মান ও পজিশন) থেকে কথা বলছেন, নতুবা জিহাদ প্রসঙ্গে আলেম নামধারী অনেকজন এমনসব কথা বলেন, তালিবুল ইলমদের সাথে এমন জঘন্য আচরণ করেন, যেগুলো হুজুর নিজে দেখলেও হয়তো বরদাশত করতে পারতেন না। আল্লাহ তাআলার এ বিধানটির যেন কোনো মা বাপ নেই।
কিতাবুস সিয়ারের দরসে যদি তাবলিগ, খানকা বা গণতন্ত্রকে জিহাদ বলা হয় (আর জিহাদকে বলা হয় হারাম বা বলা হয় জিহাদের দিন শেষ বা জিহাদ গাইরে নাফে বা উগ্রতা) আর এর বিপরীতে তালিবুল ইলম কুরআনের কোনো আয়াত, কোনো

হাদিস বা ফিকহের কোনো উদ্ধৃতি পেশ করে, উস্তাদ যদি সেগুলোর কোনো জওয়াব না দিয়ে বরং বলে দেন: শুধু আয়াত পড়ে দিলেই হবে? না কিছু বুঝতেও হবে: তখন তালিবুল ইলম কি করবে? সে কতদিন সবর করবে? যখন কোনো দিনই উস্তাদজি আয়াত হাদিস বা ফিকহের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্য উৎসের বরাতে সহীহ কোনো ব্যাখ্যা না দেখিয়ে বরং নিজেরটার উপর জেদ ধরে থাকেন: তখন উস্তাদের ব্যাপারে – আল্লাহ মাফ করুন- অটোমেটিক বদজন্ চলে আসবে।
কাজেই দলীলের প্রসঙ্গে তালিবুল ইলমদের পাশাপাশি উস্তাদদেরকেও কিছু তাম্বিহ করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো অবস্থা এমন হয়, শুধু তালিবুল ইলমের হক নষ্ট নয়, বরং শরীয়তের সাথে বেয়াদবির পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
এখন নেট দুনিয়ার বিস্তৃতি আর গোপন সূত্রের যোগাযোগের কারণে তালিবুল ইলমরা এমনসব হাওয়ালা-রেফারেন্স পেয়ে যাচ্ছে, যেগুলোর সহীহ জওয়াব না দিয়ে শুধু ধমক দিয়ে বা বেশি না বুঝার নসীহত করে দায় সারা যাবে না।
বরং সত্য কথা যদি বলি, বর্তমানে অনেক তালিবুল ইলমের জিহাদ বিষয়ে পড়াশুনা অনেক

উস্তাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এক্ষেত্রে শুধু ধমক দিয়ে বা মানসাব-মাকাম দেখিয়ে তালিবুল ইলমদের বারণ রাখা কষ্টকর, বরং অসম্ভব। বরং এ প্রচেষ্টা যত বেশি শক্ত হবে, উস্তাদের ব্যাপারে বদজনের কালি ততই বেশি গড়িয়ে লেপটিয়ে যাবে।

***

বক্তব্য ০৫ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [গাইরে আলেম, সাহাবি বিদ্বেষী এবং কট্টর সালাফিদের থেকে জিহাদ-সিয়াসত-খিলাফত সম্পর্কে নতুন নতুন আফকার শুরু হয়েছে। কিছু রিসালাতে এ সমস্ত আফকার এখন পেশ করা হচ্ছে। এসব রিসালা পেয়ে তালিবুল ইলমরা মনে করছে বড় একটা কিছু পেয়ে গেছে। মনে করছে আসমানে পৌঁছে গেছে, জান্নাতে পৌঁছে গেছে।] অভিব্যক্তি
সেই ইজমাল আর শূন্যতাটা এখানেও অনুভূত হচ্ছে:
* গাইরে আলেম, সাহাবি বিদ্বেষী এবং কট্টর সালাফি লোকগুলো কারা?
* জিহাদ-সিয়াসত-খিলাফতের ব্যাপারে তারা কি কি নতুন আফকার পেশ করছে?
* সে আফকারগুলোর পক্ষে দলীল কি?

* সেগুলো ভুল হলে শরীয়তে সহীহটা কি? এবং সে সহীহটার পক্ষে দলীল কি?
* ভ্রান্ত আফকারের পক্ষে পেশকৃত দলীলগুলোর খণ্ডন কি?
বিষয়গুলো বিস্তারিত না আসলে তালিবুল ইলমদের রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষত ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে, তালিবুল ইলমরা আপন উস্তাদদের অনেকের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। উস্তাদ একটা কথা বললে শুধু উস্তাদ হওয়ার কারণে কথাটা মেনে নেবে- এ পরিস্থিতি আর থাকছে না। দলীল প্রমাণের আলোকে আলোচনা সমালোচনাই এখন সমাধানের একমাত্র পথ।
* হয়তো বলা হবে, দলীল বুঝার যোগ্যতা তোমার নাই।
বলবো, নতুন করে দলীল বের করতে হবে না। আইম্মায়ে কেরাম যেসব দলীল দিয়ে গেছেন সেগুলো নিয়ে কথা বললেই হবে। আর ফিকহ ফাতাওয়ার এটাও একটা উসূল যে, তারজিহে তাআরুজ হলে তখন প্রত্যেক ইমাম তার নিজের পক্ষে যে দলীল পেশ করে গেছেন, আমরা আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেগুলোর একটা যাচ-পরতাল করে আমল করার চেষ্টা করবো। যেমন হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) ফতোয়ার মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

فإن قلت: قد يحكون أقـوالا بلا تـرجيح، وقـد يختلفـون في التصحيح. قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، ومـا هـو الاوفـق ومـا ظهـر عليـه التعامـل ومـا قـوي وجهـه. -الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبصار وجامع البحار (ص: 16)

"যদি বলা হয় , অনেক সময় তো বেশ কয়েকটা মত থাকে কিন্তু কোনোটার পক্ষে কারও তারজিহ থাকে না। এমনিভাবে তারজিহ দিতে গিয়ে কখনও কখনও দ্বিমত হয়ে যায় (তখন কিভাবে আমল হবে ? কোন মতের উপর আমল হবে ?)। উত্তরে বলবো : মুজতাহিদিনে কেরাম নিজেরা (কোনো মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বা পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের একাধিক মতের কোনো একটাকে তারজিহ দিতে গিয়ে) যেসব নীতি মেনে চলেছেন , আমরাও সেগুলোও অনুসরণ করবো। যেমন : উরফ-যামানা এবং জন-মানুষের জীবনাচারের পরিবর্তন লক্ষ রাখা , (এবং লক্ষ রাখা) কোনটি (যামানা ও মানুষের জীবনাচারের সাথে) অধিক খাপ খায় , কোনটির উপর আমল চলে আসছে এবং কোনটির দলীল শক্তিশালী।" -আদদুররুল মুখতার , পৃষ্ঠা : ১৬

অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কোনটার দলীল শক্তিশালী সেটাও তিনি লক্ষ রাখতে বলেছেন।

ইবনু আবিদিন শামি রহ . এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ,

(قوله: وما قوي وجهه) أي دليلـه المنقـول الحاصـل لا المستحصل؛ لأنه رتبة المجتهـد. -الـدر المختـار وحاشـية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 78)

"অর্থাৎ মুজতাহিদিনে কেরাম (নিজেদের মতের পক্ষে) যেসব দলীল দিয়েছেন বলে বর্ণিত আছে, সেগুলো। সরাসরি (কুরআন সুন্নাহ থেকে) নতুন ইসতিম্বাত নয়। কেননা, সরাসরি ইসতিম্বাত তো মুজতাহিদের কাজ (আর আমরা মুজতাহিদ নই)।" -রদ্দুল মুহতার : ১/৭৮

অজু গোসল, নিকাহ তালাকের কত জটিল বিষয়েও তো আমরা আসাতিযায়ে কেরামের পেশকৃত দলীল বুঝতে পারি, তাহলে জিহাদ কিতাল সিয়াসাতের বিষয়ে বুঝতে পারবো না কেন? অথচ কুরআনে কারীমে অযু গোসল ও তালাকের মতো বিষয়ের তুলনায় জিহাদের আয়াত অনেক বেশি।

* এখানে অত্যন্ত রহস্যজনক একটা বিষয় লক্ষ করার মতো: ইদানিং অনেক বিজ্ঞজনই অভিযোগ করছেন যে, তালিবুল ইলমরা উস্তাদদের আওতার বাহিরে চলে যাচ্ছে। উস্তাদদের কথা শুনছে না। এর বিশেষ শক্তিশালী কোনো কারণও তারা খোঁজে পাচ্ছেন না। যতটুকু অনেকে বলছেন, কিছু উগ্রবাদি লোকের দাওয়াত, কিছু উগ্রবাদি বয়ান, কিছু কিতাব-রিসালা: এগুলোই মূল কারণ।

৫/১০ বছর তারবিয়াত দেয়ার পর মাত্র দুয়েকটা কিতাব রিসালা আর বয়ান কিভাবে আমার সন্তানকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিল? তাহলে কি এতোদিন আমার তারবিয়াতে কোনো ইল্লতে খফিয়া, ইল্লতে কাদেহা ছিল; যার কারণে এত দীর্ঘ তারবিয়াতের পরও আমি আস্থার পাত্র হতে পারলাম না, দুয়েকটা উগ্রবাদি বয়ান রিসালা আমার কোল খালি করে দিল? এত অল্প সময়ে এ কয়টা বয়ান রিসালা এত আস্থার পাত্র হলো কিভাবে? বিষয়টা ভাবার দরকার।
কোনো জিদাল মিরার কথা না, আসলেই আমাদের আরও একটু ভাবা উচিত: আমাদের সন্তানদের তারবিয়াতে আমাদের কোনো ঘাটতি হচ্ছে কি’না? প্রকৃতই তাদের ইলমি, রুহানি খোরাক দিতে আমাদের কোনো কমতি হচ্ছে কি’না? নতুবা কেন একজনের একটা বয়ান তাকে আসমানে উঠিয়ে দিচ্ছে? জান্নাতে পৌঁছে দিচ্ছে? আর আমার ১০ বছরের তারবিয়াত তাকে আটকাতে পারছে না? জানা কথা, কওমির সন্তানরা আসাতিযায়ে কেরামকে পিতা মাতার চেয়েও বেশি তা’জিম করে, শ্রদ্ধা করে। এখনও আলহামদুলিল্লাহ এর ব্যতিক্রম তেমন কিছু হয়নি। তাহলে কেন এই অদৃশ্য দূরত্ব দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে?

***

বক্তব্য ০৬ (সারমর্ম হুবহু নস নয়): [কেউ কেউ বলে, ছাত্ররা শরহুস সিয়ারিল কাবির পুরা পড়েছে, আপনারা তো পড়েন না! আমি বলি, শরহুস সিয়ার পড়লেও হবে না, আরও দশ কিতাব পড়লেও হবে না। পড়া যদি হজম করতে না পার তাহলে এর দ্বারা কাজ হবে না।]
অভিব্যক্তি
মুতালাআর গণ্ডি বৃদ্ধি করতে হুজুর আলহামদুলিল্লাহ সব সময়ই তারগিব দেন। এমনকি জিহাদের বিষয়ের পড়াশুনার ক্ষেত্রেও। এটা হুজুরের ইমতিয়াজ আলহামদুলিল্লাহ। সব উস্তাদের যদি এটা থাকতো অনেক ভাল হতো। জিহাদের বিষয়ে অনেক উস্তাদ কেন জানি একটু সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। কোনো শাগরেদকে জিহাদের বিষয়ে কিছু পড়তে দেখলেই মনে করেন, শেষ! গোমরাহ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার এ মাজলুম ফরযটির ব্যাপারে এ সংকীর্ণতা অবশ্যই কাম্য না। আর কারও কারও হাল তো এমন, দরসি কিতাবের শরাহ পড়তে দেখলেও মনে করেন, গেছে! বেশি পেকে গেছে। আর পড়াশুনা হবে না। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল!
এ ধরনের সংকীর্ণ মনস্কতার কারণে জিহাদ কিতালের মতো হাল যামানার সর্বাপেক্ষা জরুরী আলোচ্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে

আসাতিযায়ে কেরামের অনেকের মুতালাআ-জানাশুনা থেকে যাচ্ছে শূন্যের কোটায়, সে তুলনায় অবাধ্য ছাত্ররা এগিয়ে যাচ্ছে অনেক দূর। এরপর পরিণতি দাঁড়াচ্ছে: উস্তাদ যখন হজম করার মতো কোনো কিছু তালিবুল ইলমদের দিতে পারছেন না, তখন শাগরেদরা নিজেদেরটা উস্তাদদের হজম করাতে চাচ্ছে। আর উস্তাদ তখন তালিবুল ইলমদের এ রোগের সুচিকিৎসার বদলে রাগ, হুমকি ধমকি, মান অভিমান দিয়ে সারতে চাচ্ছেন। নসীহত করতে গিয়ে এমনসব অবাস্তব কথা বলছেন, যেগুলো তালিবুল ইলমদেরকে উস্তাদের ব্যাপারে –আল্লাহ মাফ করুন- আরও বদজনের সম্মুখীন করছে। শায়খ আইমান যখন জনসম্মুখে ঘটা করে আমীরুল মু’মিনিন মোল্লা আখতার মানসুরের হাতে বাইয়াত দিচ্ছেন, তালিবুল ইলমরা সে ভিডিও বার বার দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ছে, মিষ্টিও খাচ্ছে, তখন যদি পর দিন দরসে এসে উস্তাদ বলেন, তালেবান ঠিক আছে, আলকায়েদা জঙ্গি: তখন তালিবুল ইলমদের মনে বাসা বাঁধতেই পারে, হাল যামানার অনেক কিছুই হুজুর জানেন না। কেউ কেউ যদি আরও আগে বেড়ে বলে ফেলে, হলুদ মিডিয়া যেভাবে বুঝায়, হুজুর সেভাবেই বুঝেন: তখন আমরা তাকে বারণ করলেও মনের সংশয় কি একেবারে দূর করতে পারি? যখন এ ধরনের

ঘটনা প্রায়ই ঘটতে থাকে, তখন সংশয়ের মাত্রাটা বাড়তেই থাকে।
যদিও এ দূরত্ব কাম্য নয়, তথাপি এটা আমাদের হাতের কামাই বলতে হবে। বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সমাধানের সঠিক পথে অগ্রসর না হয়ে যতই আমরা ভিন্ন কিছু করতে যাবো, দূরত্ব ততই বেড়ে চলবে। আল্লাহ মাফ করুন।
* আর হজমের ব্যাপারে যদি বলি, তাহলে এটি শুধু তালিবুল ইলমদের এক তরফা দোষ না। আমরা তো আসাতিযায়ে কেরামের সব কিছুই হজম করতে পারছি। উস্তাদজি অজুর ফরয চারটি পড়িয়েছেন, আমরা তো চারটিই হজম করেছিলাম। মুগনি, শারহুল মুহাযযাব বা হাত্তাব পড়ে যখন দেখলাম সংখ্যা চার, না কম, না বেশি- অনেক কথা: তখনও তো উস্তাদের ব্যাপারে বদজন হয়নি এবং আমার বিশ্বাসও নড়েনি যে, অজুর ফরয চারটিই। আমলও আমি সেভাবেই করে যাচ্ছি। তাহলে জিহাদের বিষয়ে কেন আমাদের হজম হচ্ছে না?
বাস্তবতা বলতে গেলে, কিন্তু আমি যে ক্ষুধার্ত, এটা উস্তাদজির আরও আগেই বুঝা দরকার ছিল। বুঝার পরও তিনি আমাকে দরকার মতো খাবার না দিয়ে ধমক দিয়ে ক্ষান্ত করতে চেয়েছেন। তখন আমি যা পেয়েছি তাই খেয়েছি। এ

বদ হজমের দায় শুধু আমি একার উপর বর্তানো ঠিক হবে না।

***

বক্তব্য ০৭ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [কুরআনে কারীমে ওয়াসেতা বেলা ওয়াসেতা জিহাদের আলোচনা যেসব আয়াতে এসেছে, সেগুলোর কয়টা আমি কয়টা তাফসিরের কিতাব থেকে থেকে পড়েছি? জিহাদের আয়াতগুলো তাফসিলি মুতালাআ করিনি অথচ আমি আল্লামা হয়ে গেছি।]

অভিব্যক্তি
বলতে গেলে জিহাদি মানসিকতা পোষণকারী অধিকাংশ তালিবুল ইলমেরই এ হাল। তেমন কিছু মুতালাআ না করেই গলা বাড়িয়ে কথা বলে। এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। তবে এখানে কিছু বিষয় ভাবার মতো:
* তালিবুল ইলমদের স্বাভাবিক তবিয়ত, কওমি মাদ্রাসার চিরাচরিত রীতি এবং অন্য দশটা বিষয়ে উস্তাদের সাথে তালিবুল ইলমদের আচরণ তো দাবি করে, জিহাদের বিষয়েও তারা নিজেদের নাকেস মনে করবে এবং আসাতিযায়ে কেরামকে কামেল মনে করে তাদের কথাই নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। হবার তো কথা এটাই ছিল, কিন্তু উল্টো হচ্ছে কেন?

বলতে হবে , ইল্লতে খফিয়া একটা অবশ্যই আছে এখানে। আর সে ইল্লত ; শুরু থেকে যেটা বলে আসছি: জিহাদের বিষয়ে তালিবুল ইলমদের ক্ষুধা আমরা বুঝতে পারিনি। দলীল ও বাস্তবতার আলোকে কথা বলিনি। হুমকি ধমকি , ইখরাজ আর মানসাব মাকাম দেখিয়ে সারতে চেয়েছি।

আল্লাহ মাফ করুন , যদি আসাতিযায়ে কেরাম সময় থাকতে না বুঝেন , তাহলে তালিবুল ইলমরা হয়তো এক সময় এমন ভয়ানক কথাও মনে আনতে পারে যে , আল্লাহ তাআলার সুন্নতে ইস্তিবদাল শুরু হয়ে গেছে :

{وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} [محمد: 38]

তখন আমরা তালিবুল ইলমদের যতই দোষারোপ করি, যতই বেয়াদব বলি : ভাঙা কাচে জোড়া লাগানো অত সহজ হবে না।

এজন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হবে , হাল যামানার পরিস্থিতির উপর নজর দেয়া। তাগুতি মিডিয়ার বাহিরে থেকেও খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা। উম্মাহর হাকিকি দুরবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করা। পাশাপাশি কুরআন সুন্নাহ ও ফিকহ ফাতাওয়ার কিতাবাদি নতুন করে সামনে আনা। আল্লাহর ফরযকৃত এ মাজলুম বিধানটি অন্য দশটা বিষয়ের মতোই ইনসাফ ও

দরদে দিলের সাথে অধ্যয়ন করা। তালিবুল ইলমদের সাথে নিয়েই কাজটি করতে হবে। প্রত্যেকে আপন আপন বুঝ অপরের সাথে শেয়ার করবে। বিনা দলীলে শুধু উস্তাদ হয়েছি বলে শাগরেদের বুঝটাকে খাটো করে দেখা যাবে না (বিশেষত যখন তালিবুল ইলমরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে যে, এ বিষয়ে উস্তাদের জানাশুনা তাদের চেয়ে বেশি না)।
এরপর কতটুকু মুত্তাফাক আলাইহি আর কতটুকু মুজতাহাদ ফিহি নির্ধারণ করা। মুত্তাফাক আলাইহিটা সকলে আমল করবো, মুজতাহাদ ফিহিটায় প্রত্যেককে তার আপন ইখতিয়ারের উপর ছেড়ে দেব।
তা না করে যদি জোর করে সমাধান করতে যাই, তাহলে সেই পুরান সমস্যা আবার দেখে দেবে। তালিবুল ইলমরা উস্তাদদেরকে জিহাদবিমুখ ভাবতে শুরু করবে। হায়েযের আয়াত কুরআনে কারীমে মাত্র দুয়েকটা থাকার পরও সেই ছোট কাল থেকে ফিকহের হার কিতাবে, হাদিসের হার কিতাবে, প্রত্যেক বছর একাধিক দরসে এর বিত-তাফসিল তাকরির হচ্ছে; আগেও পড়ানো হচ্ছে পরেও পড়ানো হচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে কিতাবুল জিহাদটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে: এগুলো দেখতে দেখতে এক সময় দূরত্ব আরও বাড়তে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষত ইচ্ছায়

অনিচ্ছায় তালিবুল ইলমদের মাঝে যখন ব্যাপকভাবে একটা বদ ধারণা তৈয়ার হয়েই গেছে যে, জিহাদ কিতাল জাতীয় বিষয়ে তারা একটু বেশিই জানে বুঝে : তখন এর প্রতিবিধানে একটা বড়সড় পদক্ষেপ যদি আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে না নেয়া হয়, তাহলে এ ফিতনার (!!) মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না, বরং দিন দিন তা বেড়েই চলবে। বিশেষত যখন তালিবুল ইলমরা নিজেদেরকে এ হাদিসের মিসদাক মনে করে :

لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. -صحيح البخاري (1331 /3)

* আর কিতাব না পড়েও আল্লামা হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা যদি বলি, তাহলে বলতে হবে, এটা অবশ্যই কাম্য নয়। কিন্তু কথায় আছে, বাঘ নাই বনে শিয়াল রাজা। বিষয়টা হয়েছে কি: আসাতিযায়ে কেরামের অনেকে এক বিষয়ে জ্ঞান রেখে দশ বিষয়ে নিজেকে জাহির করছেন বলে একটা ধারণা ইতোমধ্যে তালিবুল ইলমদের তৈয়ার হয়ে গেছে। বিশেষত যখন তারা জানতে পেরেছে যে, ইলম তাজাযযি কবুল করে। নুবুওয়াত ওয়াহবি হলেও (মৌলিকভাবে) ইলম কাসবি। যিনি যে বিষয়ে মেহনত করেন, তিনি সে বিষয়ে বড়, অন্য বিষয়ে তিনি শূন্যের কোটায়ও থাকতে পারেন। বিশেষত মারকাযুদ দাওয়াহর উলূমে হাদিস চর্চার মোবারক মেহনতেরে

বরকতে এ ধারণা আল্লাহর রহমতে পাকাপোক্তা হতে শুরু করেছে। বড় মসজিদের খতিব হলেই, বড় খানকার পীর হলেই কিংবা বড় মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস হলেই যে বড় আলেম: এ বদ ধারণার দিনটা শেষ হতে শুরু করেছে।
তালিবুল ইলমরা বুঝতে শুরু করেছে, ফিকহের যে বাবে যিনি মেহনত করেছেন, তিনি তা ভাল জানেন, অন্য বিষয়ে ভাল নাও জানতে পারেন। কাওসারি রহ. ও শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.র এ বিষয়ে জোরদার আলোচনার পর বিষয়টা আরও বেশি পাকাপোক্তা হয়ে গেছে। ফলে বাকি দশটা বিষয়ে ভাল জ্ঞান গরিমা থাকার পরও তালিবুল ইলমরা ভাবতে দ্বিধা করছে না যে, জিহাদের ব্যাপারে তিনি শূন্য।
এর বিপরীতে যে উস্তাদ বাকি দশ বিষয়ে এত জ্ঞান-গরিমা রাখেন না, কিন্তু জিহাদের বিষয়ে তিনি দিন রাত এক করে পড়েছেন, ভেবেছেন: তার ব্যাপারে ভাবতেও সংকোচ হচ্ছে না যে, তিনি এ বিষয়ে আল্লামা। বরং দুঃখজনকভাবে অনেকে তো নিজে নিজে কয়টা পাতা পড়ে আর কয়টা বয়ান শুনেই মনে করে বসেছে: আর দশজন বিশেষজ্ঞের চেয়ে জিহাদের ব্যাপারে সে বড় আল্লামা। যদিও এটা বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু এর দায়ভার এক তরফা আমরা তালিবুল ইলমদের উপর চাপাতে পারি না। আমরা নিজেরাই

আমাদের আস্থা নষ্ট করেছি। এজন্য এখন দশ বিষয়ে হাকিকি অর্থে আল্লামা হওয়ার পরও তালিবুল ইলমরা জিহাদের ব্যাপারে নিজেদেরকে বড় আল্লামা ভাবতে শুরু করেছে। এ ভুল ভাঙাতে যদি আমরা জিহাদ কিতালের বিষয়টাতে অনর্থক জেদ না ধরে বরং নতুন করে ইনহিমাক, ইনসাফ ও দরদে দিলের সাথে নজর দিই তো ভাল, নতুবা দিন দিন এ ভুল ধারণা গাঢ়ই হতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাফ করুন।
* আরেকটি বিষয় হলো, মুতাআল্লিকা অনেক বিষয় আমরা তালিবুল ইলমদের পড়াই, যেগুলো আমাদের এ মূহুর্তে অত বেশি দরকার না। কিন্তু যেসব বিষয় হার-হামেশাই তালিবুল ইলমদের অন্তর তাড়া করে বেড়াচ্ছে, আমরা সেগুলোর কোনো আলোচনাই উঠাই না। আম মজলিসে তো না-ই, খাস মজলিসেও না। নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ শাগরেদের সাথেও না। বরং যদি কোনো সময় ঘটনাক্রমে আলোচনা উঠে যায়, বিষয়টাতে এমনসব লা-ইলমি মন্তব্য করে তালিবুল ইলমকে ক্ষান্ত করতে চাই, যার ফলে একান্ত ঘনিষ্ঠ শাগরেদও মনে করে: বুঝেছি, হুজুর তাগুতের ভয়ে ঘুরিয়ে বলেন, কিংবা হুজুর না জেনেই কথা বলেন। যখন নির্ভরযোগ্য কারও কাছেই তাকে প্রতি মূহুর্তে তাড়া করে বেড়ানো বিষয়টার

কোনো সঠিক সমাধান পাচ্ছে না, বরং যতটুকু পাচ্ছে ততটুকু লা-ইলমি কিংবা তাহরিফ বলে মনে হচ্ছে, কিংবা কিতাব ও বাস্তবতার সাথে তার কোনো যোগসূত্র খোঁজে পাচ্ছে না: তখন অনেকটা অবচেতনভাবেই নিজেদেরকে আল্লামা ভেবে বসছে (অন্তত আপন উস্তাদের তুলনায়)। যদিও এটি ক্ষতির কারণ হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি এর দায়ভার এককভাবে তালিবুল ইলমদের উপর বর্তাবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুন।

***

দ্বিতীয় বয়ান, বা’দাল মাগরিব, ৪২ মিনিট

বক্তব্য ০৮: [এরপর হুজুর আলোচনা করেছেন যে, সিয়াসাতের ব্যাপারে নতুন আবিষ্কৃত এসব রায় কিছু লোক গোটা কাওমি মাদ্রাসার উপর মুসাল্লাত করতে চাচ্ছে। তারা মনে করছে, এগুলো প্রকাশ না করলে কিতমানে ইলমের গুনাহ হবে। অপরদিকে সাধারণ তালিবুল ইলমরা এসব মাওয়াদ হাতে পেয়ে মনে করছে তারা মুহাক্কিক হয়ে গেছে, তাহকিক তাদের হাতে চলে এসেছে। এরপর হুজুর প্রসঙ্গ এনেছেন যে, যারা এ ধরনের তাজদিদ তাহকিকের দাবি করছে, তাজদিদ-তাহকিক তো পরের কথা, এসব বিষয়ে তাদের পড়াশুনাই অনেক নাকেস-অসম্পূর্ণ।
কিতমানে ইলম প্রসঙ্গে হুজুর একটা ঘটনার উদ্ধৃতিও টেনেছেন যে, এক লোক সা’দপন্থী। সব আলেম একদিকে হওয়া সত্বেও সে সা’দপন্থী, অন্যথায় তার না’কি কিতমানে ইলমের গুনাহ হবে।]
অভিব্যক্তি
তালিবুল ইলমরা নিজেদের মুহাক্কিক মনে করার ব্যাপারে আলোচনা আগে কিছুটা গেছে। পেছনে বলে এসেছি যে, এই প্রবণতাটা আসলে এক

দিনে তৈয়ার হয়নি। জিহাদ-কিতাল-সিয়াসত-খিলাফতই শুধু না, যুগের আরও দশটা সমস্যার ব্যাপারে আসাতিযায়ে কেরামের বিশাল এক কাফেলার দীর্ঘদিনের অসচেতনতা তালিবুল ইলমরা দেখছে। দেখেছে প্রথাসর্বস্ব গতানুগতিকতা। আরও দেখেছে ধামাচাপা দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা। দেখেছে সাধারণ ও কমন কিছু বিষয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম তাহকিক আর প্রয়োজনীয় ও নাজুক অনেক বিষয়ে রহস্যজনক উদাসীনতা। এসব বিষয় দেখতে দেখতে এক সময় তালিবুল ইলমরা আসাতিযায়ে কেরামের অনেকের ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষত জিহাদ কিতাল সিয়াসত খেলাফতের বিষয়ে যখন দুনিয়াতে একটা নতুন জোয়ার বয়ে চলেছে, তখন তালিবুল ইলমদের সাথে অনেক উস্তাদের আচরণ, কট্টরপন্থী গাইরে মুকাল্লিদ লা মাজহাবি সম্প্রদায় কিংবা মাজারপূজারিদের সাথে আচরণের চেয়েও অনেক বেশি দ্বিপাক্ষিক অমানবিক অবস্থা ধারণ করেছে। যার ফলে ঘুনেধরা আস্থার প্রাসাদটা আরও দ্রুত ধ্বসে পড়েছে। আসাতিযায়ে কেরাম যদি এ ধরনের আবেগের নাজুক মূহুর্তগুলোতে দরদি অভিভাবকত্বের পরিচয় দিতেন, শান্তভাবে তালিবুল ইলমদের মানসিকতা বুঝতেন, তাদের মতামতগুলো জানতেন, বিষয়গুলোকে মানসাব-মাকাম ও উস্তাদ-শাগরিদের শাসনমূলক অবস্থান থেকে না দেখে

বরং বাস্তব দুনিয়া ও সহীহ ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন: তাহলে আশাকরি পরিস্থিতির এতো অবনতি হতো না।
এর বিপরীতে জিহাদের বিষয়ে কথা বলেন এমন অনেক উস্তাদকে দেখছে, তারা বাস্তব দুনিয়া সামনে রেখে কথা বলছেন, গতানুগতিক না। বিশেষত যখন জিহাদের অনেক বিষয়ের ব্যাপারেই ফিকহের কিতাবাদিতে ‘বিল ইত্তিফাক’ ‘বিল ইজমা’ বলা আছে। আছে কুরআনে কারীমের আবেগময়ী বর্ণনা। হাদিস ও সীরাতে আছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদি জীবনে সুবিস্তৃত বিবরণ, যা দেখলে মনে হয় যেন ঘোড়া আর তরবারি দিয়েই বিশ্বনবীকে প্রেরণ করা হয়েছে। সাহাবা তাবিয়িনের জীবনের ইলমী দিকটির অন্তরালে জিহাদি একটি জীবনও যে ছিল সেটাও অনেকে দেখেছে।
পাশাপাশি জিহাদের কথা বলার কারণে কিভাবে যে তাগুতের রোষানলে পড়তে হচ্ছে; এর বিপরীতে যারা জিহাদ বিকৃত করে চলেছে, সরকারকে কড়া হুমকি ধমকি দিতে থাকার পরও যে তাগুতি সুযোগ সুবিধা কিভাবে তাদের শামিলে হাল হচ্ছে: এসব দেখতে দেখতে তালিবুল ইলমদের মন মানসে অবচেতনভাবেই মাজলুম জিহাদের একটা মায়া পয়দা হয়ে গেছে। জিহাদের

পক্ষে যারা বলে তাদেরকে আপনজন ভাবতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক মানবিক গুণ যাদের আছে, মাজলুমের প্রতি এক রকম দরদ তাদের থাকেই। পাশাপাশি নেট দুনিয়ার বিস্তৃতির কারণে বাস্তব জিহাদি ময়দানের দৃশ্যপট ও লেখা লেখি তালিবুল ইলমদের হাতে চলে আসছে, যেগুলো তাদেরকে যাদুর মতো আকৃষ্ট করে ফেলেছে। সাহাবাদের মতো জীবন দেয়ার একটা মানসিকতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে: জিহাদের পক্ষে হলেই তাহকিক, বিপক্ষে হলেই গতানুগতিক …. এমন একটা মানসিকতা তৈয়ার হয়ে গেছে। বাছবিচার না করে ঢালাওভাবে জিহাদের পক্ষে হলেই গ্রহণ করে নেয়ার এ মানসিকতা যদিও ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু আমাদের অবহেলা অসচেতনতাই এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এককভাবে তালিবুল ইলমদের দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। আর করেও কোনো লাভ নেই। বরং দোষারোপের মাত্রা যত বাড়ছে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও তত বাড়ছে।

***

দ্বিতীয়ত হুজুর বলেছেন, এসব নব আবিষ্কৃত বিষয়ের প্রচারে আমরা লেগে গেছি অথচ এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত জানাশুনাই আমাদের নেই।

একথা বাস্তব যে, জিহাদের ব্যাপারে পড়াশুনার চেয়ে কথা বলার অভ্যাস অনেকের বেশি। তবে ঢালাওভাবে একথা বলার সুযোগ নেই যে, জিহাদের প্রচারে যারা আছে, জিহাদের ব্যাপারে যথাযথ পড়াশুনা জানাশুনা তাদের বিলকুলই নেই।
এখানে একটি বিষয় না বলে পারছি না: জিহাদের প্রচার প্রসার যারা করে, জিহাদের ব্যাপারে তাদের তো পড়াশুনা কিছু না কিছু আছে, কিন্তু বিপরীত শ্রেণির অবস্থাটা কি? তাদের পড়াশুনা কতটুকু? বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে জানাশুনা কতটুকু?
জিহাদিদের সমালোচনার পাশাপাশি বিপরীত শ্রেণিটির বিষয়ে কিছু কথা বলাও মনে হয় দরকার ছিল। যারা জিহাদকে বাপ দাদার সম্পত্তি বানিয়ে যুগের পর যুগ এর অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর দ্বীনের বিকৃতি ঘটিয়ে আসছে, তাদের ব্যাপারে কিছু না বলে, যারা এ ফরযটার জন্য ঘর বাড়ি ছেড়ে ফেরারি জীবন বেঁচে নিয়েছেন, এককভাবে তাদের সমালোচনা করাটা কেমন?
বিশেষত যখন উৎসাহ দিয়ে জিহাদের প্রতি পাগলপারা করে তোলা উলামাদের স্বতন্ত্র দায়িত্ব বলে নসসে কুরআনি দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে যারা জিহাদে নেমেছে এককভাবে তাদের

সমালোচনা মানব বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করা স্বাভাবিক।
* আর কিতমানে ইলমের প্রসঙ্গে কথা হলো, শুধু দুয়েকটি নজরি মাসআলার আবর্তে সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের উচিত বর্তমান সামগ্রিক কুফরি বিশ্বব্যবস্থার দিকে নজর দেয়া। মুসলিমদের ঈমানি, আমলী ও জাগতিক দুরবস্থার দিকে নজর দেয়া। বিবেচনা করা: এর কারণ কি? বর্তমান নামধারী মুসলিম এ তাগুত শাসকগুলো কারা? এরা কি মুসলিমদের লোক, না ষড়যন্ত্রমূলক এদেরকে মুসলিমদের উপর চাপানো হয়েছে শরীয়তের বদলে কুফরি শয়তানি জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার জন্য? এরা কি আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারি না, দাজ্জালের অনুসারি?
এসব বিষয়ে একটু মুক্তমনে ফিকির করার পর একজন সচেতন মুমিনের কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, এসব তাগুত এবং তাগুতি শাসনের বিরুদ্ধে উম্মাহকে সতর্ক না করা আসলেই কিতমানে ইলম। কিছু মাসআলায় দ্বিমত থাকতে পারে সেটা ভিন্ন কথা। সামগ্রিক সব দিক বাদ দিয়ে শুধু এমন দু’চারটি মাসআলা হাইলাইট করে সমালোচনা করা; ‘ইদ্দতটি হানাফি মাযহাব মতে হয়নি’ কাহিনির নামান্তর।

***

বক্তব্য ০৯ (সারমর্ম, হুবহু নস নয়): [জিহাদ বিষয়ক আয়াত, আহাদিস ও আসারের জামে’ মানে’ মুতালাআ করিনি। সিরাত মুতালাআ করিনি। সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ পর্যন্ত মুজাহিদিনে উম্মতের সীরাতের জামে মানে মুতালাআ করিনি। সায়্যিদ আহমদ শহীদের পর যেখানে যেখানে সহীহ তরিকায় জিহাদ হয়েছে সেগুলোর ইতিহাস মুতালাআ করিনি। শুধু শরহুস সিয়ারিল কাবির পাঁচ খণ্ড পড়ে ফেলেছি এতেই আমি মুহাক্কিক হয়ে গিয়েছি। উস্তাদদের থেকে আ’লাম হয়ে গিয়েছি।]
অভিব্যক্তি
মৌলিকভাবে এখানে দু’টি পয়েন্ট একটু আলোচনায় আনা দরকার:

এক. উস্তাদ থেকে নিজেকে আ’লাম মনে করা হুজুর যদি মাখসুস কোনো শাগরেদ ও মাখসুস কোনো উস্তাদ উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো ঠিক আছে যে, শুধু শরহুস সিয়ার পড়েই উস্তাদ থেকে আ’লাম হয়ে গেছে ধারণা করা গলদ। কিন্তু আমরা যদি অধিকাংশের হাল বিবেচনা করি, তাহলে বলতে হবে, জিহাদের ব্যাপারে শাগরেদদের তো কিছু পড়াশুনা আছে, অনেক উস্তাদের তাও নেই। অনেক শাগরেদ তো

মাশাআল্লাহ শরহুস সিয়ার আংশিক কিংবা পুরোটা পড়েছে, কিন্তু অনেক উস্তাদ কুদুরি থেকে পর্যন্ত বাবুল জিহাদ পড়েনি। এ ধরনের ক্ষেত্রে যদি জিহাদের বিষয়ে বিশেষ কোনো শাগরেদ বিশেষ কোনো উস্তাদের তুলনায় নিজেকে আ’লাম মনে করে, তাহলে ধারণাটা কি গলদ হবে? বিশেষত যখন ইলম কাসবি এবং তাজাযযি কবুল করে?
দুই. জামে মানে মুতালাআ
হুজুর হয়তো রাগের হালে বলেছেন, নয়তো মাসআলার জন্য কি এমন জামে মানে মুতালাআ শর্ত? যদি শর্ত হয়, তাহলে দেশের শতকরা একজন আলেমের একভাগ মাসআলাও কি এ ধরনের মুতালাআর পর বের হচ্ছে? তাহলে কি দেশের মোটামুটি সব আলেমের সব মাসআলাই সমালোচনার যোগ্য? তাহলে শুধু জিহাদের উপর কেন আপত্তি? দেশের প্রায় সব দারুল ইফতা ফিকহের কিতাবাদি দেখে ফতোয়া দেয়। প্রত্যেক মাসআলায় আয়াত, আহাদিস, আসার, সিরাত ও তারিখ বিততাফসিল মুতালাআ করে তারপর ফতোয়া দেয় এমন কোনো দারুল ইফতা এদেশে এখন পর্যন্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই। স্বয়ং মারকাযুদ দাওয়াহও হয়তো এমন দাবি করতে পারবে না। তাহলে এ পয়েন্টটা সামনে এনে জিহাদিদের সমালোচনা

কিভাবে হতে পারে? যতটুকু বুঝতে পারছি, হুজুর রাগের হালে বলেছেন।
অধিকন্তু আয়াত, আহাদিস, আসার, সীরাত, তারিখ এবং হাল যামানা বিততাফসিল সামনে রেখেই আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদগণ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা করি কি, দুয়েকজনের কিছু উগ্র আচরণ দেখেই গোটা জিহাদি জামাতকে মাপতে শুরু করি। এমনই যদি হয় তাহলে দুনিয়ার কোনো হক জামাত টিকবে না। স্বয়ং মারকাযুদ দাওয়ার দুয়েকজন ফুজালা থেকেই যদি জঙ্গিবাদ প্রমাণিত হয়, তাহলে কি মারকায রাজি হবেন যে আমরা বলবো, মারকাযুদ দাওয়াহ জঙ্গিবাদের কারখানা? কিন্তু মুজাহিদদের ব্যাপারে কেন জানি আমরা তিলকে তাল বানাই। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাই। প্রশ্ন হতে পারে, জিহাদি কাফেলার প্রত্যেক সদস্য কি এমন মুতালাআ, এমন জানাশুনা রাখে?
প্রশ্ন: কোনো কাফেলার হার ফরদের জন্য কি তা জরুরী?
মৌলিকভাবে পরিচালক ও নীতি নির্ধারক যারা থাকেন, বিস্তৃত জানাশুনা তাদেরই থাকে। বাকি সদস্যদের জানাশুনার একটা সীমা থাকে। যিনি যে বিভাগে যে কাজ করেন, সে অনুপাতে

তার জানাশুনা থাকে। সবার সব জানা থাকে না , দরকারও পড়ে না। আপনি কি দাবি করতে পারেন , নববী যামানা থেকে এখন পর্যন্ত অনুসরণযোগ্য হক জিহাদ যতগুলো হয়েছে সবগুলো জিহাদের সব সদস্য আয়াত , আহাদিস, আসার, সীরাত , তারিখের বিততাফসিল জ্ঞান রাখতো? না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জরুরী , না বাস্তব দুনিয়ায় এভাবে কাজ হয়। এটি হুজুর রাগের হালতে বলেছেন , নতুবা এটি কোনো ইলমী উসূলী কথা না ; না শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে , না বাস্তবতার নিরিখে।

***

বক্তব্য ১০ : [জিহাদিদের মুতালাআ যে নাকেস -অসম্পূর্ণ তা বুঝাতে হুজুর কয়েকটি আয়াত, কয়েকটি হাদিস এবং কয়েকটি মাসআলা সামনে এনেছেন :

আয়াত

{فَـإِنِ انْتَهَـوْا فَلَا عُـدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقـرة: 193]

{ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 192]

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191]

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَـى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِـلْ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ قَـالَ

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246)} [البقرة: 246]

[illegible]

* [illegible]

* [illegible]

* [illegible]

* [illegible]- [illegible]?

[illegible]

* [illegible]? [illegible], [illegible], [illegible]? [illegible]

* দারুল ইসলাম দারুল হারব প্রসঙ্গ।
* মানব রচিত কুফরি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা]
অভিব্যক্তি
প্রত্যেকটা বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। হয়তো প্রসঙ্গক্রমে এসেছে তাই হুজুর কিছু কথা বলেছেন। নতুবা এসব আয়াত, হাদিস ও মাসআলার ক্ষেত্রে হুজুরের মাওকিফ কি- তা হুজুর খুব একটা পরিষ্কার করেননি। হুজুর যদি পরিষ্কার করে বলেন: এ আয়াতের ব্যাপারে আমার মাওকিফ এই আর জিহাদিদের মাওকিফ এই, কিংবা এই হাদিস বা মাসআলার ক্ষেত্রে আমার মাওকিফ এই আর জিহাদিদের মাওকিফ এই- এমন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট অবস্থান থাকলে হয়তো আলোচনায় যাওয়া যেতো। হুজুরের মাওকিফ যেহেতু পরিষ্কার না তাই এ ব্যাপারে আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। শুধু ইজমালি কয়েকটা কথা বলতে চাই:
এক. কাফেরদের যেখানে পাও হত্যা কর
আয়াতে তো এমনই পরিষ্কার এসেছে। যে কাফের মুসলিমদের থেকে স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনো আমান গ্রহণ করেনি, তার দম হালাল। কোনো কাফেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হতে হলে দলীল লাগবে। এ বিষয়টি বিস্তারিত বয়ান করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ছিল। আমরা

অন্যান্য ছোট ছোট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলার চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ করি, কিন্তু এ ধরনের হাল যামানার দরকারি মাসআলার কোনো আলোচনা উঠাই না। কেউ এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে উল্টো নাকির করি। এ ধরনের হালতে কোনো যুবক শরীয়তের মানশার খেলাফ কিছু বুঝে থাকলে এর দায়ভার চুপ থাকা বা উল্টো বলা উলামাদেরও নিতে হবে।

দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর জুলুম বন্ধ করে দিলে

কাফেররা মুসলিমদের উপর জুলুম বন্ধ করে দিলে কি কাফেরদের দম মা'ছুম হয়ে যায়? সেসব কাফেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়? এটি তো অসংখ্য নুসুসের পরিপন্থী কথা। ফিকহের স্বাভাবিক নিয়ম তো হলো যেমনটা ইমাম কুদুরি রহ. (৪২৮ হি.) বলেছেন,

قتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا. -مختصر القدوري (ص: 231)

"কাফেররা হামলা না করলেও আগে বেড়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয।" – মুখতাসারুল কুদুরি: ২৩১

কাফেররা মুসলিমদের কন্ট্রোলে না থাকাই একটা ফিতনা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য হুমকি। তাই আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন: হয় মুসলমান হবে, না হয় জিযিয়া দিয়ে মুসলিমদের

অধীনে দারুল ইসলামে বসবাস করবে, না হয় কিতাল করা হবে। কাফেররা মুসলিমদের উপর হাত না তুললেই যে তারা নিরাপদে রাজত্ব করে বেড়ানোর অধিকার পাবে তা তো নয়।
যতটুকু জানি হুজুর ইকদামি জিহাদ অস্বীকার করেন না। তাহলে এ প্রসঙ্গটা এনে মুজাহিদদের সমালোচনার অর্থ কি?
তিন. জিহাদের জন্য বাদশা নিযুক্তি
বনি ইসরাইল জিহাদ করার জন্য নবী থাকার পরও আল্লাহ তাআলা তালুতকে বাদশা নিযুক্ত করেছেন।
বনি ইসরাইলে সাধারণত যিনি নবী হতেন, তিনি বাদশা হতেন না। এ হুকুম উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য প্রযোজ্য নয়। উম্মতে মুহাম্মাদির নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনিই নবী, তিনিই বাদশা, তিনিই জিহাদের আমীর। বরং তিনি নাবিয়্যুল মালহামা।
অধিকন্তু তালুত যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বিধায় তাকে আমীর বানানো হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায়, আমীর না থাকলে বিজ্ঞ একজনকে আমীর বানিয়ে জিহাদ করতে হবে। বিষয়টা অবশ্যই এমন নয় যে, আসমান থেকে গায়েবি আওয়াজে বিশেষ কোনো একজনকে আমীর হিসেবে ঘোষণা আসা পর্যন্ত জিহাদ বন্ধ করে রাখতে হবে; যেমনটা রাফিজিরা এক সময় বলতো।

চার. দিফায়ি জিহাদে কোনো শর্ত নেই?
যখন ফিলহাল আক্রমণ চলছে, তখন যে যা পায় তাই দিয়ে প্রতিহত করতে পারবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে করতে হবে। এর বেশি কোনো শর্ত নেই। কাফেররা কোনো মুসলিমকে বন্দী করে নিয়ে যেতে থাকলেও একই কথা।
পক্ষান্তরে যখন কোনো ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে চলে যায় কিংবা কিছু মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে, তখন সেসব মুসলিমদের মুক্ত করা ও সে ভূমি উদ্ধার করার জন্য ফিল হাল সামর্থ্য না থাকলে সম্ভাব্য উপায়ে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। ফিল হাল নেমে পড়া জরুরী না। সামর্থ্য না থাকার কারণে ফরয রহিত হয়ে যায় না। ফরয ফরযই থেকে যায়। সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। মুজাহিদিনে কেরাম এ প্রস্তুতিরই দাওয়াত দিচ্ছেন। আজই দা বল্লম নিয়ে নেমে পড়ার কথা তারা বলেন না। যার তার কথাকে মুজাহিদিনে কেরামের মানহাজ মনে করে সমালোচনা করা ঠিক হবে না।
পাঁচ. ফাতহে মক্কায় কাফেরদের নিরাপত্তা প্রদান
রাসূল আলাইহিস সালাম মক্কাবাসীদের হত্যা করেননি, নিরাপত্তা দিয়েছেন। এটি মূলত সিয়াসাতের বিষয়। কাফেররা পরাজিত

হওয়ার পর তাদের হত্যা করা হবে, না যিম্মি বানানো হবে, না গোলাম-বাদি বানানো হবে তা মাসলাহাতের উপর নির্ভর করে। যেটা ভাল মনে হয় করা হবে। মুজাহিদিনে কেরাম তো এ কথা বলেন না যে, সর্বাবস্থায় কাফেরদের হত্যা করে নিঃশেষ করে দিতে হবে। মুজাহিদিনে কেরাম বলেন, তিলে তিলে কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিতে হবে, যেমনটা রাসূল মক্কাবাসীর সাথে করেছেন। এরপর আমরা যখন বাগে পাবো, মাসলাহাত বুঝে কাউকে মাফ করবো, কাউকে হত্যা করবো; যেমনটা রাসূল করেছেন। ছয়. বীরে মাউনায় সাহাবায়ে কেরামকে নির্মমভাবে শহীদ করার পরও রাসূল আলাইহিস সালাম পাল্টা যুদ্ধ করেননি
এটিও সামর্থ্য ও সিয়াসাতের বিষয়। বীরে মাউনায় সাহাবায়ে কেরামকে যখন শহীদ করা হয়, রাসূল আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম যদি জানতে পারতেন, অবশ্যই তরবারি হাতে জীবন বাজি রেখে বেরিয়ে পড়তেন।
শহীদ করে দেয়ার পরের ঘটনার ব্যাপারে কথা হলো, জিহাদ আর কিসাস এক নয় যে, মুসলিমদের প্রতিটি আঘাতের বদলে কাফেরদের সমান সংখ্যায় আঘাত করতে হবে কিংবা প্রতিজন মুসলিমের রক্তের বিনিময়ে একটা একটা কাফেরকে হত্যা করতে হবে। তবে মুসলিম

হত্যার এ ধরনের করুণ ঘটনা মুমিনের রক্ত শাণিত করে। জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনে কারীমে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা এ ধরনের বিষয়াদি উল্লেখ করে মুমিনদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমাদের দশা হলো, ফিল হাল লাখো লাখো মুসলিম কাফেরদের নির্যাতনে পিষ্ট হচ্ছে অথচ আমাকে দেখলে বা আমার কথা শুনলে মনেই হয় না যে, মুসলিমদের আহাজারি আমাকে ব্যথিত করছে। এ ধরনের প্রসঙ্গ উঠানোই যেন অন্যায়। রোহিঙ্গা গণহত্যার সময় আর কিছু না পারলেও অন্তত রাসূলের অনুসরণে কেন দেশের মসজিদগুলোতে মাসব্যাপী কুনুতে নাযিলা পড়া হলো না?
সাত. ছুলহে হুদায়বিয়া
হুদায়বিয়ায় তো এক উসমান রাদি.র রক্তের বদলা নিতে চৌদ্দশত সাহাবি মওতের উপর বাইয়াত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। পরে যখন দেখা গেল উসমান রাদি.কে কাফেররা হত্যা করেনি, তখন সে ইচ্ছা তরক করা হয়।
এ তো গেল শুধু একজন মুসলিমের বদলা নেয়ার জন্য রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ। আর আমাদের দশা তো আমার সামনে দিয়ে আমার ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলেও আমি নির্বাক।

রোহিঙ্গা গণহত্যা তো আমাদের সামনে দিয়ে হয়ে গেল। ভারত ও কাশ্মিরে তো প্রায় একশো বছর ধরে হত্যা নির্যাতন চলছে। কই, আমরা তো মওতের উপর বাইয়াত হলাম না। শুধু খোঁজে খোঁজে সুযোগ ও ছাড়গুলো বের করাই যেন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। রাসূলের জীবনের আজিমতগুলো কি অনুসরণীয় নয়?

আট. আলজিহাদু মাদিন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ যদি বিধান হয়, তাহলে তো পরিষ্কারই যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত ফরয, আর আমরা সে ফরয তরক করে গুনাহগার হচ্ছি। (উল্লেখ্য, ফিকহ ও উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে এ হাদিসকে বিধানই ধরা হয়েছে।)
আর যদি খবর হয়, তাহলে জিহাদের আহাম্মিয়াত কত বুঝা যায়। সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও আল্লাহ তাআলা এ প্রিয় আমলটি উম্মাহর যুবকদের দিয়ে করাতে থাকবেন। কেউ তা রুখতে পারবে না।
আর চলতে থাকবে বলতে উরফান যেটাকে চলা বলে। যেমন ধরুন আমেরিকার সাথে তালেবানের যুদ্ধ চলছে। এর অর্থ এই নয় যে, আফগানের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে প্রতি মূহুর্তে

গোলাগুলি চলছে। প্রতি মূহুর্তে প্রতিটি ভূখণ্ডে চলতে থাকবে: এমন কোনো কথা কোনো মুজাহিদ শায়খ বলেছেন বলে আমার জানা নেই। এ ধরনের অবান্তর শ্রুতি কথায় মুজাহিদিনে কেরামের সমালোচনা মুজাহিদদের প্রতি জুলুম বৈ কি হতে পারে? হুজুরের কাছে আবেদন থাকবে: কোনো একজন গ্রহণযোগ্য মুজাহিদ শায়খের লেখনি বা বক্তৃতায় যেন হুজুর কথাটি দেখান। নয়. মক্কার মুস্তাদআফিন
মক্কার নির্যাতিত মুসলিমরা জিহাদ করেনি একচেটিয়া বলা যায় না। আবু বাসীর রাদি.র নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের সত্তর জনের মতো এক কাফেলা গেরিলা পদ্ধতিতে জিহাদ করে মক্কাবাসীদের নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। দুর্বল হালেও কিভাবে জিহাদ দাঁড় করাতে হয় আবু বাসীর রাদি. শিখিয়ে গেছেন।
আফসোসের বিষয় হুজুর অন্য এক মুহাজারায় বলেছেন, ‘আবু বাসীর রাদি. যা করেছেন তা সহীহ কিন্তু তা আমাদের জন্য দলীল হবে না।’ আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না: সাহাবায়ে কেরামের এত বড় একটা কাফেলা দীর্ঘদিন যাবত কাজটি করে গেলেন, স্বয়ং রাসূলের সামনেই তা করেছেন, রাসূল নিজে তা সমর্থন করেছেন (বরং হাফেয ইবনে হাজার রহ.র মতে রাসূল তাতে উৎসাহও দিয়েছেন) এরপরও উম্মতের জন্য কেন

তা দলীল হবে না? তাহলে হুজুরের দৃষ্টিতে দলীলের মাপকাঠি কি আল্লাহ মালুম।
আর যদি বলা হয়, মক্কার বাকি মুসলিমরা তো জিহাদ করেনি? যতটুকু বুঝতে পারছি, হুজুর এটাকেই দলীল বানাতে চাচ্ছেন। এটাও এক আশ্চর্য যে, সাহাবায়ে কেরামের এক তায়েফা শক্তি না থাকায় জিহাদ করেননি, সেটা তরকে জিহাদের দলীল হতে পারবে, আর রাসূলসহ গোটা সাহাবা জামাতের সমর্থনে সাহাবাদেরই আরেক তায়েফা জিহাদ করেছেন সেটা উম্মতের জন্য দলীল হতে পারবে না, আমলযোগ্য হতে পারবে না, আদর্শ হতে পারবে না!!
বেশির চেয়ে বেশি বলতে পারি, যাদের হাল মক্কার মুস্তাদআফিনদের মতো, তারা আপাতত জিহাদ না করলে সমস্যা নেই (শুধু সমর্থন করে গেলেই হবে), আর যারা নিজেদেরকে আবু বাসীর রাদি.র মতো মনে করেন, তারা জিহাদ করবে। কিন্তু জিহাদ করলে সমালোচনার যোগ্য হয়ে যাবে: এমনটা বোঝার মতো কিছু মুক্কার মুস্তাদআফিনদের মাঝে আছে বলে তো দেখছি না। দশ. তাগুত শাসকরা কি কাফের?
শরীয়ত প্রত্যাখ্যানকারী, কুফরি বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী এবং সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ তাগুত শাসকরা কাফের বলে উম্মাহর

বহু বড় বড় আলেম ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন। কারও যদি দ্বিমত থাকে, আদবের সাথে পেশ করতে পারেন। এমন ধরনের আলেমদের সমালাচনা করা মুজাহিদিনে কেরাম নিজেদের জন্য হারাম গণ্য করেন। মুজাহিদিনে কেরাম সমালোচনা তাদেরই করেন, যারা নিজেদের বুঝকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, অহেতুক সমালোচনা করে এবং তাগুতের পথ সুগমকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। এগার. তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন কুফর শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি দারুল হারব?
যারা তাগুতদের কাফের গণ্য করেন, তাদের মতে এসব রাষ্ট্র দারুল হারব। কাফেরদের শাসনাধীন কুফরি আইনে পরিচালিত আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ভূখণ্ডগুলো দারুল হারব- এটাই স্বাভাবিক। কারও দ্বিমত থাকলে আদবের সাথে পেশ করতে পারেন। এ ধরনের মাসআলা মদের লাইসেন্স দেয়া বা যিনা বৈধ করে দেয়ার মতো মাসআলা নয় যে, এগুলো সামনে আসলে নাউযুবিল্লাহ বলা যায় (যেমনটা হুজুর রাজবাজির বক্তব্যে করেছেন)। বেশির চেয়ে বেশি বলতে পারেন, মুখতালাফ ফিহি। মুখতালাফ ফিহি মাসআলায় অন্যের সমালোচনা অবশ্যই কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাগুতদের সমালোচনা ততটুকু করি না, যতটুকু মুজাহিদদের করি। আমাদের অবস্থা

যেন দাঁড়িয়েছে যেমনটা রাসূল আলাইহিস সালাম বলে গেছেন ,

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ. -صحيح البخاري (3/ 1219)

***

সামনে ইনশাআল্লাহ ‘কাফের হত্যার সবব কি’ এবং ‘ইসলামের আফু -সাফহে জামিল’ নিয়ে একটু আলোচনা করবো।

***

কাফের হত্যার সবব : কুফর না মুহারাবা এবং মুহারাবা বিল ফে’ল, না বিল কুওয়াহ ?

বক্তব্য ১১ (দুয়েক কালিমা বাদে হুবহু নস): [একবার আলকাউসারে লেখা হয়েছিল, ‘শুধু কাফের হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা যায় না।’ এটার উপর নারাজ হয়ে গেছে অনেকে। শুধু কাফের, এজন্য কতল করে দিবা যেখানেই পাও? তাদের নিকট শুধু কুফরটাই মুজিবে কতল। শুধু কুফরটাই মুজিবে কতল হলে মদীনার ইয়াহুদিদের জালাওয়াতন করা হল কেন? শুধু কুফর কতলের ইল্লত হলে রিজাল নিসার ফরক কেন? এরা ধরেছে যে, শুধু কুফরটাই হচ্ছে মুজিবে কতল। তাহলে মুতালাআ কি পরিমাণ তাদের!] (বাদ মাগরিব বয়ান, ১৩-১৪ মিনিট) অভিব্যক্তি
মুজাহিদিনে কেরাম কখনও বলেন না যে, রিজাল নিসায় ফরক নেই, জালাওয়াতনের সুযোগ নেই। নারী-পুরুষ, মুকাতিল-ফানি সব কাফেরকে মেরে দুনিয়া কাফেরমুক্ত করে ফেলতে হবে এমন কথা মুজাহিদিনে কেরাম বলেন না। শুধু আলকাউসারের লেখার উপর একজন আপত্তি করেছেন সে ভিত্তিতে মুজাহিদিনে কেরামের ব্যাপারে এমন কথা বলাটা কি শোভা পায়? হুজুরের কাছে আবেদন থাকলো: যেন দু’চারজন গ্রহণযোগ্য মুজাহিদ শায়খের বক্তব্য বা লেখা দেখান যারা বলেছেন, সব কাফেরকে হত্যা করে ফেলতে

হবে ; নারী পুরুষেও ফরক নাই , জালাওয়াতন বা জিযিয়ারও সুযোগ নাই।

হুজুর আলকাউসারের যে লেখাটার কথা বলেছেন , সেটা গুলশান হামলার পর ছেপেছিল। শিরোনাম ছিল :- (প্রসঙ্গ : গুলশান - হত্যাকাণ্ড : 'সর্বস্তরে দ্বীনী তালীমের বিস্তার ঘটানো [ময়ের দাবি " : "কোনো অমুসলিমকে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা বৈধ নয় " : 'জিহাদের [ঠিক ব্যাখ্যা মুসলমানদের জানানো উচিত] এটি নিষিদ্ধ করলে সমস্যার [মাধান হবে না]"

মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ , মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক)

প্রথমত : গুলশান হামলা আমরা সমর্থন করি না। আলকায়েদার মুজাহিদিনে কেরাম এ হামলার ব্যাপারে দীর্ঘ খণ্ডন লিখেছেন। ধরে ধরে দেখিয়েছেন যে , এ হামলা কৌশলগত দিক থেকে ভুল ছিল।

এ হামলায় কয়েকজন বিদেশি কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিল। নিহতদের মাঝে দুয়েকজন মহিলাও সম্ভবত ছিল। আলকাউসারে এ হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে। তবে নিন্দা যে দৃষ্টিকোণ থেকে এবং যে শিরোনামে জানানো হয়েছে , তাতে আপত্তির সুযোগ আছে। এ হিসেবেই হয়তো কেউ আপত্তি করেছিল। আর সে আপত্তির জের ধরেই

[illegible]

[illegible] “[illegible]-

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

[illegible]

[illegible]-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَـةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

[illegible]

[illegible]

মুসলিম দেশে ভিসা নিয়ে অন্য ভাষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে থাকছে তারা যে মুআহাদের অন্তর্ভুক্ত এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ।”

বুঝা যাচ্ছে , মারকাজের মূল আপত্তিটা ছিল , ভিসা নিয়ে আসা কাফেরদের হত্যা করা জায়েয হয়নি।

কিন্তু এখান থেকে এ নতিজা বের করা যায় না যে , জিহাদিরা কাফের মাত্রই হত্যা করে ফেলা জায়েয মনে করে : চাই সে মহিলা হোক বা শায়খে ফানি বা চুক্তিবদ্ধ কাফের।

বিষয়টি একটু গোঁড়া থেকে বুঝানোর চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ :

কাফেরকে হত্যা করা কেন জায়েয এবং এর কি সবব- এ ব্যাপারে মুজতাহিদিনে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। মৌলিকভাবে এখানে দুই কওল :

ক. কারও কারও মতে কুফরটাই সবব (যতটুকু জানি , ইমাম শাফিয়ি রহ . এর মত এটি)। অতএব, প্রতিটি কাফেরের মাঝেই হত্যার সবব বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে : হত্যার শর্ত পাওয়া গেলে এবং ভিন্ন কোনো দলীল না পাওয়া গেলে প্রত্যেক কাফেরকেই হত্যা করা যাবে। এ হিসেবে শায়খে ফানি , অন্ধ , পঙ্গু , বিকলাঙ্গ কাফেরদেরকেও তারা হত্যা করা জায়েয বলেন।

তবে তারাও মহিলাদের হত্যা করা জায়েয বলেন না , যদি মহিলারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবে কিতালে অংশ না নেয় বা সহযোগিতা না করে। কারণ ,এ ধরণের মহিলাদের হত্যা করতে পরিষ্কার হাদিসে নিষেধ এসেছে।

এমনিভাবে নাবালেগ শিশুদের হত্যা করাও জায়েয বলেন না। কারণ , হত্যা জায়েয হওয়ার একটি শর্ত হলো , বালেগ হওয়া। শুধু সবব পাওয়া গেলেই হত্যা করা যায় না , যদি শর্তগুলো ঠিকমতো পাওয়া না যায়। যেমন যাকাত ফরয হওয়ার সবব হচ্ছে সম্পদ। কিন্তু সম্পদ থাকলেই যাকাত দিতে হয় না। শর্ত হলো , এ বিশেষ সম্পদের উপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে।

খ. জুমহুরের মতে কাফেরকে হত্যা করা জায়েয হওয়ার সবব হচ্ছে মুহারাবা। তবে মুহারাবা বিল ফে ’ল না , বরং মুহারাবা বিল কুওয়াহ। অর্থাৎ যেসব কাফের মুহারাবা তথা যুদ্ধে অংশ নেয়ার মতো সামর্থ্য রাখে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয , যদিও তারা যুদ্ধে না আসে।

ইমাম মারগিনানি রহ . (৫৯৩ হি .) বলেন,

المبيح للقتل عندنا هو الحراب. -الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 380)

“আমাদের (হানাফি মাযহাব) মতে কতলের বৈধতাদানকারী হচ্ছে মুহারাবা।” –হিদায়া : ২/৩৮০

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

فلزم قتل ما كان مظنة له، بخلاف ما ليس إياه. –فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 453)

“অতএব, মুহারাবার সম্ভাব্য শক্তি যার মধ্যে আছে, আবশ্যিকভাবেই তাকে কতল করা জায়েয সাব্যস্ত হয়।” –ফাতহুল কাদির : ৫/৪৫৩

কাসানী রহ. (৫৮৭ হি.) বলেন,

والأصل فيه أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله، سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض، وأشباه ذلك على ما ذكرنا. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 101)

“এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যে কিতালের উপযোগী তাকে কতল করা হালাল; সে কিতালে আসুক না আসুক। আর যে কিতালের উপযোগী নয় তাকে হত্যা করা হালাল নয়। তবে যদি সে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিংবা মতামত, নেতৃত্বদান, উদ্বুদ্ধকরণ বা এ জাতীয় অন্য কোন মাধ্যমে -যা আমরা উল্লেখ করেছি- পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহলে

তাকেও হত্যা করা হালাল হয়ে যাবে। ” -
বাদায়িউস সানায়ে : ৭/১০১

সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

المقاتلة من له بنية صالحة للقتال إذا أراد القتال؛ وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال، فلا يكونون من المقاتلة وإن باشروا قتالا بخلاف العادة. ألا ترى أن من لا يقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة باعتبار أن له بنية صالحة للقتال وإن كان لا يباشر القتال لمعنى. . شرح السير الكبير (ص: 1808، 1809)

“(শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) মুকাতিল (তথা হত্যার উপযোগী) হচ্ছে যার শারীরিক গঠন এমন উপযোগী যে, কিতাল করতে চাইলে করতে পারবে। মহিলা ও শিশুদের শারীরিক গঠন কিতালের উপযোগী নয়। কাজেই ... তারা মুকাতিল শ্রেণীভুক্ত হবে না। ... বালেগ পুরুষরা কিতাল না করলেও মুকাতিল শ্রেণীভুক্ত। কারণ, কোনো কারণে কিতালে না আসলেও কিতাল করার মতো শারীরিক যোগ্যতা তার আছে। ” – শারহুস সিয়ারিল কাবির, পৃষ্ঠা ১৮০৮, ১৮০৯

তবে হানাফি মাযহাবের নীতি হলো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই যেসব কাফের কিতালে অংশ নেয় না এবং কিতালের ব্যাপারে তাদের কোনো ফিকিরও নেই, এমন কাফেরকে হত্যা না করাই ভাল। তবে হত্যা করলে নাজায়েয হবে না। এমনিভাবে সৈনিক বা

নেতৃস্থানীয় কাফেরদের উপর হামলা চালালে ঘটনাক্রমে অন্যান্য কাফের মারা পড়লেও সমস্যার কিছু নেই।
যেহেতু স্বাভাবিক দুনিয়ার নিয়মানুযায়ী মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধের উপযোগী নয় তাই যুদ্ধে অংশ না নিলে তাদের হত্যা করা জায়েয নেই। এমনিভাবে এ মতানুযায়ী বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পঙ্গু ও শায়খে ফানিকে হত্যা করাও নাজায়েয। যেহেতু যুদ্ধে শরীক হওয়ার মতো শারীরিক সামর্থ্য তাদের নেই।
তবে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো নারী বা শিশু বা অক্ষম কাফের যদি যুদ্ধে অংশ নিয়ে বসে, তাহলে তাকে হত্যা করা জায়েয। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য। উপরোক্ত দুই মত অনুযায়ী নতিজা দাঁড়াচ্ছে:
ক. স্বাভাবিক অবস্থায় নারী ও শিশুদের হত্যা করা উভয় মতানুযায়ীই নাজায়েয। তবে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেয় বা সহযোগিতা করে তাহলে জায়েয।
খ. সুস্থ বালেগ কাফের পুরুষদের হত্যা করা উভয় মতানুযায়ী জায়েয, যদিও তারা যুদ্ধে না আসে।

গ. পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, শায়খে ফানি, অন্ধ: এসব কাফেরকে, যারা বলেন, হত্যার সবব হচ্ছে কুফর তাদের মতে হত্যা করা জায়েয। আর জুমহুরের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের হত্যা করা নাজায়েয, যেমন নারী শিশুদের নাজায়েয। তবে যদি তারা তাদের অক্ষমতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশ নিয়ে বসে বা সহযোগীতা করে তাহলে তাদের হত্যা করা জায়েয, যেমনটা নারী শিশুদের বেলায় জায়েয।
তাহলে দুই মাযহাবের ব্যবধানটা দাঁড়াচ্ছে শুধু অক্ষম কাফেরদের বেলায়। অন্যথায় যুদ্ধোপোযোগী বালেগ কাফেরদের হত্যা করা সবার মতেই বৈধ- যদিও তারা যুদ্ধে না আসে। এ ব্যাপারে আরও কিছু তাফসিল আছে, আমরা আপাতত সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

***

এবার গুলশান হামলায় আমরা দেখছি কয়েকটা কাফের পুরুষ আর মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। পুরুষগুলোকে হত্যা করা বৈধ, তা তো বলাই বাহুল্য। আর মহিলাগুলোর ক্ষেত্রেও নাজায়েয বলা মুশকিল। কারণ, কুফরি বিশ্ব থেকে আগত এসব মহিলা মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো এজেন্ডার অংশ হিসেবে আসে। নতুবা এতো স্বাদের দুনিয়া ছেড়ে তারা আমাদের বাংলাদেশের মতো নিম্ন মানের গরীব

রাষ্ট্রে এসে পড়ে থাকতো না। এসব মহিলা মূলত কাফেরদের হাতিয়ার। এ হিসেবে এগুলোও মুবাহুদদম।
তাছাড়া তাদেরকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে, না’কি বিশেষ পরিস্থিতিতে হত্যা করতে হয়েছে, না’কি ঘটনাক্রমে মারা গেছে: অনেক রকমের সম্ভাবনা আছে। অতএব, নাজায়েয হয়েছে পরিষ্কার বলা যায় না।

***

রইল ভিসা। যেহেতু তাগুত শাসকরা মুরতাদ বলে অসংখ্য গ্রহণযোগ্য উলামার ফতোয়া আছে, আর যারা হত্যা করেছে তারা এসব তাগুতকে মুরতাদ মনেও করে: এ হিসেবে তাগুতদের ভিসার কোনো মূল্য হত্যাকারীদের কাছে নেই। এক হারবি কাফের আমান দিয়ে অন্য হারবি কাফেরকে এনেছে, এতে হত্যাকারীদের কিছু যায় আসে না। ভিসা প্রদানকারীরা হত্যাকারীদের আমীরুল মুমিনিন বা সুলতান নয় যে তারা ভিসা দিলে তা হত্যাকারীদের উপর বর্তাবে। এ হিসেবে ধরা হবে, এসব মুহারিব কাফের কোনো আমান ছাড়াই হত্যাকারীদের সামনে ছিল। তাদের হত্যা করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নাজায়েয ছিল না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি: গুলশান হামলা কৌশলগত দিক থেকে সমালোচনার যোগ্য হলেও

আলকাউসারে যেভাবে সমালোচনা করা হয়েছে সেভাবে সমালোচনাযোগ্য ছিল না।
অধিকন্তু হারবি দেশের কয়েকটা কাফের হত্যায় মারকাজ এত কড়া সমালোচনা করতে পারলো, হাজার হাজার মুসলিমকে যে এরাই নৃশংসভাবে প্রতিনিয়ত হত্যা করে চলছিল, তখন কেন এমন দু’চারটা সমালোচনা মারকাজ থেকে আসলো না? কাফেরদের তুলনায় মুসলিমদের রক্তের কি তেমন কোনো মূল্য নেই? এখনও তো প্রতিবেশি ভারতে মুসিলমদের উপর দিয়ে কত কি বয়ে যাচ্ছে। কই, মারকাজকে তো এসব নিয়ে সরগরম দেখা যায় না, যতটা জিহাদিদের বিরুদ্ধে দেখা যায়।

***

আমরা দেখতে পাচ্ছি: গুলশান হামলা কৌশলগতভাবে যাই হোক, মৌলিকভাবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে জায়েয বলার দালিলিক ভিত্তি আছে। কিংবা বলা যায় অন্তত তাবিল করলে একে জায়েয বলা যায়। যেসব যুবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হামলাটি করেছে, আর যাই হোক, যেহেতু তাবিল করার সুযোগ আছে, বিষয়টাকে একেবারে এভাবে সমালোচনার মুখে না দাঁড় করানো কি ভাল ছিল না? বিশেষত যখন মুসলিম উম্মাহর দরদই তাদেরকে জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের কি উচিত না মুমিনদের প্রতি

সুধারণা রাখা? তাবিল করে হলেও তো মুমিনের কাজ সহীহ করার চেষ্টা করা চাই।

***

দেখতে পাচ্ছি: কাফের হলেই হত্যা করা জায়েয- এমন ধারণা গুলশানে পাওয়া যায়নি। বরং তাবিল করে হলেও হত্যার একটা দালিলিক ভিত্তি আছে। শুধু কাফের হলেই হত্যা করে ফেলা জায়েয- এমন দৃষ্টিকোণে থেকে হত্যা করেছে বলা যায় না।
আর আলকাউসারের লেখার উপর যিনি আপত্তি করেছেন, তিনি কি শব্দে কেমন আপত্তি করেছেন, তা না দেখে মন্তব্য করা যায় না। যদি ধরে নিই তিনি এমনটাই বলেছেন যে, কাফের হলেই হত্যা করা যায়: তাহলে এর দায়ভার আমভাবে মুজাহিদিনে কেরামের উপর কেন চাপানো হচ্ছে? মারকাজের ধারণামতে যেসব শাগরেদ বিচ্যুতির শিকার, তাদের দায়ভার তো মারকাজ নেয় না, তাহলে দুয়েক জনের বিচ্যুতি (যদি বাস্তবে বিচ্যুতি হয়ে থাকে) কেন গোটা জামাতের উপর চাপানো হবে?
হুজুরের প্রতি আবারও আবেদন: গ্রহণযোগ্য দু’চারজন মুজাহিদ শায়খের উদ্ধৃতি যেন হুজুর দেন, যারা বলেছেন, কাফের হলেই হত্যা করা জায়েয, পুরুষ নারীর ব্যবধান নেই, সক্ষম

অক্ষমের ব্যবধান নেই, কিংবা আমানের কোনো ই’তিবার নেই।
আলকায়েদা তালেবান আলহামদুলিল্লাহ চল্লিশ বছর ধরে গোটা দুনিয়াব্যাপী জিহাদ করে আসছে। তাদের সীরাত কি বলে? তাদের মাশায়েখদের শত শত কিতাব, বয়ান, রিসালা বিদ্যমান। হুজুর যেন মেহেরবানি করে নিজের দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করেন, না হয় যেন হুজুর পরিষ্কার করেন যে, এটা দুচারজনের বিচ্যুতি, আমভাবে মুজাহিদদের অভিমত না। না হয় হুজুরের বক্তব্য থেকে অনেকে ভুল বুঝবে। আর এর দায়ভার তখন দুনিয়া আখেরাতে হুজুরের কাঁধেও বর্তাবে।

***

ইসলামে আফু-সাফহে জামিল
বক্তব্য ১২ (দুয়েক কালিমা বাদে হুবহু নস): [এখন যে কড়া কড়া কথা শুনানো হচ্ছে, মনে হয় যেন ইসলামের মধ্যে আফু আর দরগুজারের যা আছে সব মানসুখ হয়ে গেছে। আফু এবং সাফহে জামিল –এর কোনো কিছু ইসলামে আর বাকি নাই। এবং সূরা মুমতাহিনার ঐ আয়াতও মানুসুখ হয়ে গেছে যেখানে ভাগ করা হয়েছে। কাফের মুশরেকদের দুই ফরিক করেছেন আল্লাহ তাআলা সূরা মুমতাহিনায়। কারও সাথে সুন্দর আচরণ করা যাবে, তাদের প্রতি ইহসান করা যাবে, আর

কারও প্রতি কোনো ইহসান করা যাবে না। দুই ভাগ আছে না সূরা মুমতাহিনাতে ? তো সূরা মুমতাহিনা কবে নাযিল হয়েছে ? এটাকে মানসুখ করলো কোন আয়াতে? ... আফু আর সাফহের আয়াত সব মানসুখ ! এ ধারণা সহীহ না।] (মাগরিব বাদ বয়ান , ২৬-২৯ মিনিট)

অভিব্যক্তি

কড়া কড়া কথাগুলো কে বলছে তা হুজুর স্পষ্ট করেননি। কেউ কোনো ভুল কথা বললেই সেটার দায় কি মুজাহিদদের উপর এসে পড়বে ?

তাছাড়া কড়া কড়া কথাগুলো কি তাও হুজুর বলেননি। তখন দেখা যেতো এ ধরনের কঠোরতা শরীয়তের মানশা কি ’না , না ’কি বাড়াবাড়ি। নতুবা কাফেরদের প্রতি কঠোরতা শরীয়তের নির্দেশ। এটাই সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।

ক. আল্লাহ তাআলা তার নবীকে কাফেরদের প্রতি কঠোর হতে আদেশ দিয়ে বলেন ,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. – التوبة: 73

“হে নবী ! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। ” –তাওবা : ৭৩

[illegible],

يَاأَيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُــوا قَــاتِلُوا الَّذِينَ يَلُــونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. –التوبة: 123

“[illegible], [illegible]” –[illegible]: [illegible]

[illegible], [illegible],

مُحَمَّدٌ رَسُــولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَــهُ أَشِــدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. -الفتح: 29

“[illegible]; [illegible]” –[illegible]: [illegible]

[illegible], [illegible],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. –المائدة: 54

“[illegible], [illegible],

[illegible] …" – [illegible]

***

[illegible]

[illegible]

فَــإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرِّقَــابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُـوهُمْ فَشُـدُّوا الْوَثَـاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْـدُ وَإِمَّا فِـدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. -محمد: 4

“অতএব, যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও, তখন তোমরা তাদের গর্দান মারবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের মাঝে খুব রক্তপাত করে শেষ করবে, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। এরপর হয় (তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে। তোমাদের প্রতি এটিই নির্দেশ, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে।” –মুহাম্মাদ: ৪
তো আমরা আফু সাফহে জামিলের পরিচয় দেব কাফেরদের মাঝে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার পর। এরপর যখন তারা আমাদের হাতে বন্দী হবে কিংবা নত হয়ে আমাদের সামনে অস্ত্রসমর্পণ করে আত্মসমর্পণ করবে, তখন আমরা সাফহে জামিলের পরিচয় দেব।
সূরা মুমতাহিনায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু বলা হয়নি। সূরা মুমতাহিনা নাযিল হয়েছে ছুলহে হুদায়বিয়া এবং মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি সময়ে। এ সূরায় মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল মুসালিম কাফেরদের প্রতি ইহসানের অনুমতি দেয়া হয়েছে (ওয়াজিব করা হয়নি)। যাদের প্রতি ইহসানের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

ক. তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিতাল করেনি, মুসলিমদের দ্বীনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি;
খ. মুসলিমদেরকে তাদের আপন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেনি।
পক্ষান্তরে যারা:
ক. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিতাল করেছে এবং তাদের দ্বীনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে; খ. মুসলিমদেরকে তাদের আপন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছ;
গ. কিংবা অন্তত উচ্ছেদকরণে কোনোভাবে সহায়তা করেছে বা করার ইচ্ছা ছিল- এ ধরনের কাফেরদের প্রতি ই’সান করতে বারণ করা হয়েছে।
বুঝতে পারলাম না সূরা মুমতাহিনা আর সাফহে জামিলের প্রসঙ্গ এনে হুজুর কি বুঝতে চাচ্ছেন।
* যারা আমার বোনের উড়না ধরে টানাটানি করছে কিংবা হিজাব খোলে নিতে হাত বাড়াচ্ছে;
* যারা আমার আদরের সন্তানকে গাছের সাথে, ওয়ালের সাথে আছড়ে আছড়ে হত্যা করছে;
* যারা আমার বৃদ্ধ বাবাকে বুটের আঘাতে শহীদ করেছে;

* যারা আমার যুবক ভাইকে অন্ধকার জেলে পুরে নির্যাতনের ষ্টিম রোলারে তিলে তিলে নিঃশেষ করছে;
আমার মা, বোন, পিতা, মাতা আর সন্তানের সাথে যাদের এই আচরণ: হুজুর কি বলতে চাচ্ছেন, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকবো আর সাফহে জামিল করতে থাকবো?
আমার দ্বীন, আমার উম্মাহ সব পদদলিত হতে থাকবে আর আমার কোনো করণীয় নেই? শুধু সাফহে জামিল?! এ ধরনের হালে উম্মাহর সকল ইমাম সশস্ত্র জিহাদ ফরযে আইন বলেছেন। যে হালে আমার হাতে অস্ত্র উঠানো ফরয, সে হালে আমি কিছুই না করে শুধু সাফহে জামিল করতে থাকবো; যদি এটিই হুজুরের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ কেমন কথা বুঝতে পারলাম না।
হয়তো বলতে পারেন, আমাদের তো সে শক্তি নেই? তাহলে বলবো, শক্তি না থাকলে ই’দাদের দাওয়াত হবে, শুধু সাফহে জামিলের কেন?

***

বক্তব্য ১৩ (দুয়েক কালিমা বাদে হুবহু নস): [শরীয়তের জিহাদ রহমত। শরীয়তের জিহাদ, কুরআন সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহিনের মাঝে যে তাসাব্বুর ছিল জিহাদের, ঐভাবে জিহাদকে পেশ করতে হবে। জিহাদের যে সমস্ত নতুন নতুন মাসআলা আবিষ্কার করেছে গাইরে আলেম

মুজাহিদরা; জিহাদ করেছেন উনি, কিন্তু গাইরে আলেম; গাইরে আলেম মুজাহিদরা যেসমস্ত নতুন মাসআলা আবিষ্কার করেছে, বা মু’তাদিল নয় এমন শুধু রেওয়ায়েতি আলেম, নকল আর রেওয়াতে বড় আলেম, তাদের আবিষ্কৃত মাসআলা: এগুলো দ্বারা জিহাদের শরাহ করা, জিহাদকে চিনানো, জিহাদের তাআরুফ করানো অন্যায়। সে জন্য আমাদের জামে মানে মুতালাআ থাকা জরুরী। আল্লাহ তাআলা ঐ রকম মুতালাআ আমাদেরকে দান করেন।] (মাগরিব বাদ বয়ান, ২৮-৩০ মিনিট)
অভিব্যক্তি
হুজুরের বক্তব্য থেকে যে কেউ বুঝবে, বর্তমান জিহাদিরা জিহাদের যে ব্যাখ্যা করে, জিহাদের যে তাসাব্বুর তারা পেশ করে, জিহাদ বলতে তারা যে জিনিস বুঝাতে চায়, তা কুরআন সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহিনের বুঝের পরিপন্থী। শরীয়তের জিহাদের সাথে তাদের এ বুঝের কোনো মিল নেই।
পাশাপাশি এও বুঝবে যে, জিহাদিদের কোনো আলেম নেই। কয়েকটা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর ব্যবসায়ী জমা হয়ে জিহাদ শুরু করে দিয়েছে (হুজুরের সামনের বক্তব্যে এমন কথা আসছে) আর এসব অজ্ঞ লোক নিজেরা জিহাদের বিকৃত একটা রূপ উম্মতের সামনে পেশ করছে।

কিংবা কয়েকটা রেওয়ায়েতি ও গতানুগতিক আলেম তাদের সাথে আছে। শরীয়তের সহীহ সঠিক রূপ অনুধাবন করতে অক্ষম এসব অপরিপক্ক আলেম না জেনে না বুঝে জিহাদকে বিকৃত করেছে আর সে বিকৃত জিহাদ উম্মতের সামনে পেশ করছে। হুজুর এর আগে দুঃখ করে এসেছেন যে, এসব বিকৃত ধ্যান ধারণা এখন কওমি মাদ্রাসায় প্রচার হচ্ছে এবং তালিবুল ইলমরা এগুলো গিলেও নিচ্ছে, ফিরানো যাচ্ছে না।
সত্য কথা বলতে গেলে, জিহাদি বলতে হুজুর কাদের বুঝাতে চাচ্ছেন সেটাই বুঝা যাচ্ছে না। নয়তো প্রকৃত জিহাদিদের খোঁজ-খবর যদি হুজুরের থাকতো, আশাকরি হুজুর এমন মন্তব্য করতে পারতেন না।
আরেকটা কথা হলো, বর্তমান প্রজন্মের যেসব উলামা তুলাবা জিহাদে জড়াচ্ছে, তারা কিন্তু একেবারে গতানুগতিক না। বরং ইলমি দিক দিয়ে তারা আর দশজন উলামা তুলাবা থেকে কোনো অংশে কম না, দুনিয়ার হালচাল জানাশুনার দিক থেকেও কম না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা দুনিয়ার হালচালের খবরাখবর একটু বেশি জানে। যদি চলমান জিহাদের তাসাব্বুরটা একেবারেই শরীয়ত পরিপন্থী হতো, জাহেল মূর্খদের আবিষ্কৃত নতুন বিদআত হতো, তাহলে ব্যাপকভাবে যি-ইস্তি’দাদ এবং দ্বীনের

গাইরতওয়ালা উলামা তুলাবারা তা কবুল করতো না।
সবচে’ ভাল হতো হুজুর যদি দেখাতেন যে, জিহাদিরা জিহাদের এই তাসাব্বুর পেশ করছে, আর শরীয়তের সহীহ জিহাদের তাসাব্বুর হচ্ছে এই। সহীহ রূপটা তুলে না ধরে প্রচলিতটাকে শুধু ভুল বলে গেলে তো আর উম্মত সহীহটা পাবে না। উলামায়ে কেরাম, যারা জিহাদের সহীহ রূপ জানেন, তারা যদি সে সহীহটা উম্মতের সামনে পেশ না করেন, তাহলে উম্মত হয় জিহাদ ছেড়ে গুনাহগার হবে, না হয় এ ভুল তরিকায়ই জিহাদ করতে থাকবে। তখন এর দায়ভার সেসকল জাননে ওয়ালা উলামাদেরও নিতে হবে।
অধিকন্তু হুজ্জত দিয়ে মোকাবিলায়ই আহসান তরিকা। আপনি বলবেন আমারটা ভুল, আমি বলবো আপনারটা ভুল। এই কাদা ছোড়াছুড়িতে উম্মতের কি ফায়েদা? উভয় পক্ষের মতামত সামনে আনা হোক। উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ সামনে আনা হোক। এরপর পর্যালোচনা করা হোক যে, কোনটা সহীহ আর কোনটা গলদ, কোনটা মুত্তাফাক আলাইহি কোনটা মুখতালাফ ফিহ।

***

বক্তব্য ১৪ (দুয়েক কালিমা বাদে হুবহু নস): [আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করছি, সেটা হলো: মুজতাহাদ ফিহ মাসআলা আর মানসুস আলাইহ

মাসআলা দুইটায় ফরক আছে কি’না? মানসুস আলাইহ আর মুজতাহাদ ফিহ, মুজমা আলাইহ আর মুখতালাফ ফিহ একই স্তরের সব? যেই মাসআলাটা মুজতাহাদ ফিহ আবার মুখতালাফ ফিহ, সেই মাসআলার মধ্যে আমি একটা রায়ের উপর এসরার করতে পারি?
আমি ঐ ভাইদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে, বিলাদু ইসলামিয়ার মধ্যে যে হুককাম, শাসকগোষ্ঠী, বিচার বিভাগের হুককাম আর প্রশাসনের হুককাম, এই যে হুককামকে পাইকারীভাবে –যেহেতু দেশের মধ্যে কানুনে ওয়াজয়ি আছে-; কানুনে ওয়াজয়ি ওয়ালা দেশ, গণতান্ত্রিক দেশে ঐটার হুককাম সব মুরতাদ। মুরতাদ্দুন। একটা মত আছে কি’না? এই মত প্রচার করা হচ্ছে কি’না এখন কওমি মাদ্রাসার ভিতরে? হচ্ছে। তো আমি বললাম, এই মাসআলাটা কি মুজতাহাদ ফিহ? না মানসুস আলাইহি? ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনযাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন- এইটা তো নস। কিন্তু এই নসের মধ্যে কি কুফরে আমলি না কুফরে মুখরিজ মিনাল মিল্লাহ, লাম ইয়াহকুমের কোন সূরতের জন্য মুখরিজ মিনাল মিল্লাহ আর কোন সূরতের জন্য কুফরে আমলি কুফরুন দুওনা কুফরিন: এইখানে দুই তাফসির আছে তো? তাহলে এইখানে তো দালালতের দিক

থেকে নসসে কতয়ি হইল না। ঠিক না? দালালতের দিক থেকে নসসে কতয়ি হয়েছে? না। তাহলে একবারে আম ভাষায়, পাইকারি হারে মুরতাদ্দুন, হুককামুল বিলাদিল ইসলামিয়া আললাতি ইয়াসুদু ফিহাল কানুনুল ওয়াদয়ি মুরতাদদুন বলা হচ্ছে কি’না? এই যে পাইকারীভাবে মুরতাদ্দুন বলা হচ্ছে, এই কওলটা গলদ। কিন্তু আমি তাকে হালকা করে বললাম, গলদ এ কথা বলি নাই। আমি বলছি, তোমাদের এই আয়াতটা কি মুজতাহাদ ফিহ না মানসুস আলাইহ? বলে মুজতাহাদ ফিহ। আরে! আচ্ছা, কিচ্ছা সব কথা শেষ! যদি মুজতাহাদ ফিহ হয় তাহলে তুমি কে একবারে এই মুজতাহাদ ফি মাসআলার মধ্যে তুমি যে ইজতিহাদ গ্রহণ করলা সে ইজতিহাদ সব ছাত্রকে গিলিয়ে দিতে হবে, খাইয়ে দিতে হবে, মাদ্রাসার ইনতেজামিয়ার বিরুদ্ধে, উস্তাদদের বিরুদ্ধে? উস্তাদদের ভিন্ন ইজতিহাদ তোমার ভিন্ন ইজতিহাদ। তোমার ইজতিহাদ সব কওমি মাদ্রাসার হার ফরদকে গিলায়া দিতে হবে, এইটা কে বললো? কে ফরয করেছে এটা? মুজতাহাদ ফিহ মাসআলার মধ্যে এটার অবকাশ আছে একজন তালিবুল ইলম একজন মাওলানা সাহেব, উলুমুল হাদিস পড়ছে ইফতা পড়ছে, ধরেন ভাল যি- ইস্তি’দাদ, দ্বীনি গাইরত আছে, খুব ভাল। কিন্তু উনি উনার যে ইজতিহাদ বা রায়কে

তারজিহ দিবেন সেইটা সবার উপর মুসাল্লাত করে দেয়ার কি অধিকার রাখেন?
… আজকাল কোনো ইঞ্জিনিয়ার, কোনো ডাক্তার, কোনো ব্যবসায়ী, তাদের থেকে মাসআলা নিয়ে, নয় সাহাবা বিদ্বেষীদের থেকে মাসআলা নিয়ে, সেই মাসআলা সবাইকে খুব গিলাইতে চাচ্ছ, খাওয়াইতে চাচ্ছ, আর তুমি নিজেই বল সেই মাসআলা মুজতাহাদ ফিহ। এইটার অবকাশ আছে? সবার উপরে মুসাল্লাত করা? তোমার রায় নিয়ে তুমি থাকো। শেষ। ছাত্রদেরকে তার উস্তাদদের সাথে ছেড়ে দাও। ছাত্র তোমার মতো আল্লামা হলে ঠিক আছে তোমার রায় গ্রহণ করুক। ছাত্রকে কেন পেরেশান কর? মা’কুল কি মা’কুল না কথাটা? তো তালিবুল ইলমদের এইটা বুঝার সালাহিয়াত হয় না কেন? এতটুকু জ্ঞান নেই কেন যে এইটা যদি আয়াতের বদিহি মাসআলা হতো, তো আমাদের হুজুররা সবাই বেখবর থাকতো এটা কেমন কথা? … কি এ সমস্ত জাহালত শুরু হয়েছে!! কিছু আকল আর বসিরত পয়দা কর।] (মাগরিব বাদ বয়ান, ৩২-৩৮ মিনিট)

অভিব্যক্তি
* শরীয়াহ প্রত্যাখান করে মানবরচিত কুফরি আইন মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেয়া তাগুত

শাসকরা মুরতাদ: হুজুর বলেছেন এ মতটি গলদ। সবচে’ ভাল হতো হুজুর যদি বলতেন যে, ‘এটি আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে গলদ’। উম্মাহর বিশ্বস্ত মুতাবাহহির শত শত বরেণ্য উলামা এদেরকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন। পূর্ববর্তী আইম্মাদের থেকেও এর বিপরীত কিছু আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নজরে পড়েনি। এ ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে নিজের মতের বিপরীতটাকে ঢালাওভাবে গলদ বলে দেয়া কতটুকু উসূলসম্মত?
হুজুর প্রায় সময়ই বলেন, মহল্লে নেযায় নস দেখাও। হুজুরের কাছে আমার আবেদন থাকবে, মহল্লে নেযায় যেন হুজুর একটা নস দেখান। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত যে তাগুত শাসকদের প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা, হুবহু এই ধরনের শাসকদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইম্মাদের থেকে কোনো একটা জুযয়ী নস যেন হুজুর দেখান, যেখানে তাদেরকে কাফের না বলে মুমিন বলা হয়েছে।
* মাসআলা মুখতালাফ ফিহি হলে আমি আমার নিজের মত ব্যক্ত করতে পারি। বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই। তাহলে কি হুজুর বলতে চাচ্ছেন আমি আমার নিজেরটা বলতেও পারবো না? যদি তাই হয় তাহলে হুজুর কেন নিজের মতটা প্রকাশ করছেন এবং বিপরীতটার সমালোচনা

করছেন? এ অধিকার মুজাহিদদের না থাকলে, হুজুর এ অধিকার কোন উসূলের ভিত্তিতে পাচ্ছেন? হুজুর যে আন্দাজে যে ভাষায় মুজাহিদদের মতের সমালোচনা করছেন, ঠিক একই ভাষায় একই আন্দাজে যদি মুজাহিদগণ হুজুরের মতের সমালোচনা করেন, হুজুর কি মেনে নেবেন?
* হুজুর অন্য এক মুহাজারায় পরিষ্কার করেছেন, সাহাবি বিদ্বেষী দ্বারা উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহ. উদ্দেশ্য।
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী দ্বারা কারা উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। সম্ভবত ডাক্তার দ্বারা আলকায়েদার বর্তমান আমীর শায়খ আইমান আলজাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) আর ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা আলকায়েদার সাবেক আমীর শায়খ উসামা বিন লাদেন (রাহিমাহুল্লাহ) উদ্দেশ্য। নিশ্চিত করে বলি না। হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে গাইরে আলেম হলেও উম্মতের দরদে, উম্মতের জন্য যারা নিজেদের জান জীবন ধন সম্পদ সুখ শান্তি সব কুরবানি দিয়ে দিলেন, তাদের ব্যাপারে আরেকটু নরম ভাষা ব্যবহার করলে তো হুজুর পারতেন।
আর উস্তাদ সায়্যিদ কুতুবকে হুজুর বেশ জোরেসোরে সাহাবি বিদ্বেষী বলেন। উসমান রাদি.র না’কি তিনি সমালোচনা করেছেন। এ

বিষয়টা একটু ভাবা দরকার। ভুলের সমালোচনা করলে কি ব্যক্তির সমালোচনা হয়? সাহাবায়ে কেরাম ভুলের উর্ধ্বে নন। তাদের থেকে কিছু বিষয়ে ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সে ভুল উম্মতের আদর্শ নয়। উম্মতকে আদবের সাথে তা বুঝিয়ে বলতে হবে। কেউ যদি সে ভুলের সমালোচনা করতে গিয়ে যতটুকু আদব ইহতিরাম বজায় রাখার দরকার ছিল তা রাখতে না পারে: তাহলে কি আমরা তাকে সাহাবি বিদ্বেষী বলতে পারি?
এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের কোনো মাওকিফকে যদি কেউ ভুল মনে করে অথচ বাস্তবে তা ভুল ছিল না, তাহলেও কি এ কারণে আমরা তাকে সাহাবি বিদ্বেষী বলতে পারি? না এটা তার খাতা-ভুল হিসেবে ধরবো?
ইমাম জাসসাস রহ. মুআবিয়া রাদি.র ব্যাপারে শক্ত কথা বলেছেন। এ কারণে কি আমরা তাকে সাহাবি বিদ্বেষী বলে দিয়েছি? হুজুর তো প্রায়ই জাসসাসের হাওয়ালা দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে ইমাম তাবারি, নাসায়ি, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরিসহ অসংখ্য ইমামের মাঝে টুকটাক শি-ইয়্যাত ও ই’তিযাল বিদ্যমান। মুআবিয়া রাদি. ও আমর বিন আস রাদি.র মতো কয়েকজন সাহাবির ব্যাপারে তাদের কেমন অবস্থান তা সকলের জানা। কই, আমরা তো

তাদেরকে সাহাবি বিদ্বেষী বলি না। কেন বলি না? আসলে তারা সাহাবিদের সমালোচনা করেন না, সাহাবিদের থেকে হয়ে যাওয়া ভুলের সমালোচনা করেন এবং এমনভাবে করেন যা না করা উচিত ছিল। উস্তাদ সায়্যিদ কুতুবের বিষয়টাও আমি যতটুকু বুঝি এমনই। সায়্যিদ কুতুব রহ.র কিতাবাদি তো প্রকাশ্যেই আছে। দেখলেই তো বিচার করা যাবে।
তাছাড়া সায়্যিদ কুতুব রহ. প্রথম জীবনে একজন সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পূর্ণরূপে ইসলামি জীবন শুরু করেছেন বেশ পরে। ইসলামী জীবনের আবার দুইভাগ: প্রথম দিক ও শেষ দিক।
ইসলামী জীবন শুরু করার আগের এবং ইসলামী জীবনের প্রাথমিক দিকের কিতাবাদিতে তার কিছু সমালোচনাযোগ্য বিষয় আছে। শেষ দিকের কিতাবাদিই তার আসল যিন্দেগী। সেগুলো দিয়েই তাকে বিচার করা উচিত। আগের অনেক বিষয় থেকেই তিনি সেগুলোতে রুজু করেছেন। আসলে সাহাবি বিদ্বেষী হচ্ছে রাফিজিরা। আর ছিল তখনকার খাওয়ারেজরা, যারা আলী রাদি. ও মুআবিয়া রাদি.সহ উভয় গ্রুপের সাহাবিদের কাফের মনে করতো। এছাড়া আহলে সুন্নাহর কেউ সাহাবি বিদ্বেষী না। কোনো কোনো সাহাবির কোনো কোনো মাওকিফের সমালোচনা করলেও তা

সাহাবি বিদ্বেষ থেকে নয়। কিন্তু এরপরও কেন জানি আব্দুল মালেক সাহেব হুজুর উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহ.কে সাহাবি বিদ্বেষী বলে প্রচার করেন। এটা কোন যুক্তিতে কোন দলীলে আল্লাহ মা’লুম।
এক শায়খ বলেছেন, সায়্যিদ কুতুব যামানার ভাষায় তাওহিদ পেশ করেছেন। তিনি সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন। যামানার কুফরি শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সে কুফরকে তিনি সাহিত্যের আঁচড়ে যামানার ভাষায় বোধগম্য করে মুসলিম জনসাধারণের সামনে পেশ করেছেন। এ অপরাধেই তাকে আজীবন নির্যাতন সইতে হয়েছে এবং শেষে তাগুতি আদালত তাকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করেছে। একজন মাজলুম মুসলিমের ব্যাপারে হুজুর যদি আরেকটু নরম ভাষা ব্যবহার করতেন।

***

* মুজাহিদিনে কেরাম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার থেকে মাসআলা নেন না, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা নিজেরাও মাসআলা দেন না। জিহাদ গোটা উম্মাহর উপর ফরয। উম্মাহর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা উম্মাহর গ্রহণযোগ্য উলামাদের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে জিহাদে নেমেছে। পাশাপাশি নিজেরাও জিহাদে নিয়ে পড়াশুনা করেছে। জেনেছে বুঝেছে। নিজেদের

সব কিছু জিহাদের পথে, দ্বীনের পথে কুরবান করেছে।
* আমরা আলেম বলতে যারা মাদ্রাসায় পড়েছে, দাওরা ইফতা বা এমন কোনো সনদ আছে তাদেরকে বুঝি। সমাজে স্বাভাবিক এমন লোকদেরকেই আলেম মনে করা হয়। কিন্তু যতটুকু জানি হুজুরের মাওকিফ এমন না। দাওরা পাশ করে বেড়িয়ে গেলেই হুজুর আলেম মনে করেন মনে হয় না। বর্তমানে যারা দাওরা ইফতার সনদ গ্রহণ করে, যোগ্যতার বিচারে তাদের ক’জনকে আলেম বা মুফতি বলা যায়?
আলেম, মুফতি- এগুলো তো মূলত যোগ্যতার নাম। যদি যোগ্যতার হিসাব হয়, তাহলে প্রচলিত মাদ্রাসায় পড়েছে কি’না তার হিসাব হবে না। হিসাব হবে যোগ্যতার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হুজুর যাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী বলছেন, তাদের অনেকেই প্রচলিত হাজারো আলেমের চেয়ে বড় আলেম ধর্তব্য হবেন।
আরব বিশ্বে আলেম হওয়ার জন্য আমাদের উপমহাদেশের মতো আলাদা মাদ্রাসা নেই। সেখানে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তারাই আলেম হতে পারে, আবার তারাই ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে।

এরপরও বলি, মুজাহিদিনে কেরাম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে মাসআলা নেয় না, নেয় মানহাজ। শায়খ উসামা বা জাওয়াহিরি থেকে মুজাহিদরা মাসআলা নেয় না, নেয় মানহাজ, কাজের পন্থা। আর কর্মপন্থা তো অভিজ্ঞতার বিষয়। তার জন্য আলেম হওয়া জরুরী না, এমনকি মুসলিম হওয়াও জরুরী না। ইসলাম এ ব্যাপারে উদার। এটি জাগতিক বিষয়। জাগতিক বিষয় কারও নিজের কামাই না, আল্লাহর দান। আল্লাহ তাআলা যেখানে যেটা রেখেছেন সেখান থেকে সেটা গ্রহণ করে সমৃদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ করাই শরীয়তের নির্দেশ। এ কারণে আমরা দেখতে পাই:
* খন্দকের যুদ্ধে রাসূল পরিখা খনন করেছেন। এ পরিখা খনন আরবে প্রচলিত ছিল না। পারস্যের অগ্নিপূজারি মুশরিকদের তরিকা এটা। রাসূল সেটাই গ্রহণ করেছেন।
* রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে দাব্বাবা (তখনকার যামানার এক প্রকার ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র) শিখার জন্য জুরাশে পাঠিয়েছেন।
* উমর রাদি. সর্বপ্রথমি আদমশুমারি ও দিওয়ান ব্যবস্থা জারি করেন। যতটুকু মনে পড়ছে এটিও মূলত তখনকার কাফেরদের তরিকা ছিল।

* একই কারণে সমরবিশেষজ্ঞগণ মাওঁ সেতুং থেকে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ হচ্ছে মানহাজ। কাজের পন্থা। যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে।
ইসলামের ইতিহাসে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. ইলমের ময়দানের বড় কেউ না, কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় তার জুরি নেই। এজন্য রাসূল আলাইহিস সালাম ও আবু বকর রাদি. তাকেই আমীর বানাতেন, যদিও তার থেকে বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটে যেতো।
হুজুর সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ.র জিহাদকে ফিতরি জিহাদের মডেল হিসেবে পেশ করেন (যদিও এ বিষয়ে আমার আপত্তি আছে, আপাতত সেদিকে যাচ্ছি না)। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. তো আলেম নন। আমরা তার থেকে মাসআলা নেব না, নেব মানহাজ। কাজের পন্থা। মুজাহিদরা এমনটাই করেন আলহামদুলিল্লাহ। মাসআলা আলেমদের থেকে নেন; মানহাজ সমরবিশেষজ্ঞ উলামা, উমারা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ থেকে নেন।

***

* আর তাকফিরের ব্যাপারে কথা হলো, মুজাহিদিনে কেরাম আলহামদুলিল্লাহ তাকফিরের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব

মেনে চলেন। তবে আমাদের উচিত খাওয়ারেজ ও আইএসের মানহাজ দিয়ে সবাইকে বিচার না করা।
হুজুর তাকফিরে হুককামের মাসআলা এনেছেন। হুজুর অন্য এক মুহাজারাতেও এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। হুজুরের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে একমাত্র এ আয়াত ছাড়া অন্য কোনো দলীল নেই। আসলে বিষয়টি এমন নয়। অনেক দলীলের মাঝে এটিও একটি দলীল। এজন্য এক শায়খ বলেছেন: ‘অনেকে এ আয়াতটি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করে। এজন্য তাকফিরে হুককামের ক্ষেত্রে এ আয়াতটি দিয়ে আমি দলীলই দিই না।’
এ আয়াতের কিছু সূরত কুফরে আমলি আর কিছু সূরত মুখরিজ মিনাল মিল্লাহ। মুজাহিদিনে কেরাম ঢালাওভাবে সব সূরতকে মুখরিজ মিনাল মিল্লাহ বলেন না, বিশেষ সূরতকে বলেন।
আর হুজুর যেভাবে পেশ করছেন যে, ঢালাওভাবে সব মুরতাদ: আসলে মুজাহিদিনে কেরামের মাসআলা এমনটাও না। এ কারণেই ইসলামী দলগুলোকে তাকফির করা হয় না। বিচারকদেরকেও সবাই কাফের বলেন যে তা না। এমনকি কোনো কোনো শাসককেও কাফের বলেন না, যাদের নিয়ত ভাল বুঝা যায়। যেমন জিয়াউল হককে আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. কাফের বলেননি। কারণ, সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, তিনি সামর্থ্য পেলে ইসলাম কায়েম করতেন। সামর্থ্য না

থাকায় যতটুকু পেরেছেন করেছেন। হুজুর যেভাবে পাইকারি হারের কথা বলছেন আসলে সে রকম না।
তবে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো: দাওয়াত ও ওয়াজ এক জিনিস, ফিকহি হুকুম আরেক জিনিস। গণতন্ত্র কুফর, শাসকরা মুরতাদ: এগুলো মূলত দাওয়াতের ভাষা, ওয়াজের ভাষা। দাওয়াতের সময় বিষয়টি এভাবে মোটা করে পেশ করাই কাম্য। ফিকহি তাহকিক তাদকিকের সময় অনেকে মুস্তাসনা হবে সেটা ভিন্ন কথা।
* হুজুর মুখতালাফ ফিহ মাসআলার একটি উসূল বয়ান করেছেন যে, নিজের রায় অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না।
কথা সঠিক। কিন্তু –যেমনটা আগেও বলেছি- আমি যেমন আমার রায় অন্যের উপর চাপাতে পারবো না, আমার উপরও অন্য কেউ তার নিজের রায় চাপাতে পারবে না। কিন্তু এখন তো অবস্থা দাঁড়িয়েছে: মুজমা আলাইহ, মানসুস আলাইহ, সুস্পষ্ট কুরআন সুন্নাহর মাসআলা বলতে গেলেও আমাকে বহিষ্কার করা হয়। জিহাদের কথা বলাই তো অপরাধ, হাকিমিয়ার মাসআলা তো পরের কথা।
আরাকান, আফগান, কাশ্মির, ইরাক, শাম: এসব ভূমিতে জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কার

সন্দেহ আছে? কিন্তু আমাকে সেটাও কি বলতে দেয়া হয়? বা এ মানসিকতা রাখতে দেয়া হয়? যদিও জিহাদের মাসআলার অনেক কিছুই মুজমা আলাইহি, তথাপি ধরলাম অনেক বিষয় মুখতালাফ ফিহ আছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি আমার মতো আমল করবো, আরেকজন তার নিজের মতানুযায়ী আমল করবে। যেমন তাকফিরের মাসআলা যদি ধরি, তাহলে দলীল প্রমাণের আলোকে কারও মনে হতে পারে যে, এসব শাসক মূলত ব্রিটিশ, আমেরিকা, ভারতের এজেন্ট। তাদের কুফরি ধর্ম (আধুনিক সংবিধানের নামে) মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিতে এসব শাসককে তারা ব্যবহার করছে। এরা মূলত মুসলিম উম্মাহর কেউ না। এরা দ্বীনে ইসলামকে অবশ্যপালনীয় মনে করে না, বরং মানবতার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে। এমন লোক ঈমানদার হতে পারে না। এরা বেঈমান।
যাদের বিশ্বাস এমন, তারা এদেরকে মুরতাদ মনে করবে, এদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয মনে করবে। সে অনুযায়ীই হবে তাদের কর্মপন্থা। পক্ষান্তরে যারা দলীল প্রমাণের আলোকে এদেরকে বিদেশীদের এজেন্ট বা বেঈমান মনে করবে না বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিহাদ আবশ্যক মনে করবে না, তাদের কর্মপন্থা হয়তো সে রকম হবে না। কিন্তু যারা জিহাদ ফরয মনে করে তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না।

প্রত্যেকে আপন মতানুযায়ী আমল করবে। যেমনটা থানবি রহ. বলেছেন,

کسی امر موجبِ کفر کی دلالت علی الکفر یا اس امر موجب کفر کا ثبوت قرائن مقامی یا مقالی ک اختلاف س مختلف فی ہو سکتا ہے۔ اور خود قطعیت بھی کبھی مختلف فی ہو سکتی ہے کحرمہ متروک التسمی عامداً اسی طرح کبھی اجماع مختلف فی ہو سکتا ہے --- اس صورت میں ہر عامل اپن عمل میں معذور ہوگا۔ امداد الفتاوی جدید ۔ جدید مطول حاشی شبیر احمد القاسمی جلد 11 صفح نمبر: 167

"কোনো কুফরি বিষয় পরিষ্কার কুফর বুঝাচ্ছে কি'না এবং কুফরি বিষয়টি (ব্যক্তি থেকে) সুস্পষ্ট প্রমাণিত কি'না; কথাবার্তার ধরন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে তাতে মতভেদ হতে পারে। তদ্রূপ বিষয়টি অকাট্য কুফর কি'না তাতেও মতভেদ হতে পারে। ... বিষয়টি সর্বসম্মত ও মুজমা আলাইহি কুফর কি'না তাতেও দ্বিমত হতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যে মত অনুযায়ী আমল করবে, সেক্ষেত্রে তাকে মা'জুর ধরা হবে (সমালোচনা করা যাবে না)।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া (জাদিদ): ১১/১৬৭

মুজতাহাদ ফিহ ও মুখতালাফ ফিহ বিষয়ের এটিই হলো মূলনীতি। কিন্তু এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, জিহাদ বিরোধী সব কিছু উসূল

জাওয়াবেতের মারপ্যাঁচে জায়েয করা হবে। জিহাদের বিষয়ে কথা বললেই হয়ে যাবে উগ্রতা, বেয়াদবি, জাহালত কিংবা সাতহিয়াত।
* হুজুর বলেছেন,

“তোমার রায় নিয়ে তুমি
থাকো। শেষ। ছাত্রদেরকে তার উস্তাদদের সাথে ছেড়ে দাও। ছাত্র তোমার মতো আল্লামা হলে ঠিক আছে তোমার রায় গ্রহণ করুক। ছাত্রকে কেন পেরেশান কর?”
আসলে জিহাদ কাউকে জোর করে গ্রহণ করানো হয় না। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে। যে কাজে পা দিলেই মরণের ভয়, তা কি কাউকে কেউ জোর করে গ্রহণ করাতে পারে? তাছাড়া মুজাহিদিনে কেরামের নিজেদেরই তো মাথা গুঁজার ঠাই নাই, আরেকজনকে কিভাবে জিহাদে আসতে পেরেশান করবে? বরং তানজিমুল কায়েদার তো উসূল হলো, কেউ নিজে থেকে আসতে চাইলেও না নেয়া। সর্ব দিক বিচেনায় প্রয়োজন মনে করলে নেয়া হবে, নয়তো নেয়া হবে না। কোনো তালিবুল ইলমকে পেরেশান করে মুজাহিদিনে কেরাম কাউকে নেয় না আলহামদুলিল্লাহ। বরং মুজাহিদিনে কেরামই পদে পদে পেরেশানির শিকার হন।
* হুজুর বলেছেন তালিবুল ইলমদেরকে উস্তাদদের হাতে ছেড়ে দিতে। যতটুকু বুঝতে পারছি এ কথার উদ্দেশ্য: উস্তাদদের যে মত,

যে রায়, তালিবুল ইলমরা সে মত গ্রহণ করে থাকতে চাইলে আমরা যেন তাদেরকে সে মত থেকে ঘুরানোর চেষ্টা না করি।
যদি এমনটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে কিছু কথা আছে:
* এমন অনেক উস্তাদ আছেন আলহামদুলিল্লাহ যারা প্রচলিত জিহাদে বিশ্বাসী। তাকফিরে হুককামে বিশ্বাসী। সেসব উস্তাদের ভক্ত ছাত্র যারা আছে, তাদেরকে কি তাদের উস্তাদের জঙ্গিবাদি মত গ্রহণে স্বাধীনতা দেয়া হবে না? হুজুরের কথামতো তো স্বাধীনতা দেয়ার কথা। যদি এমনটাই হয়, তাহলে জঙ্গি উস্তাদ ও শাগরেদদেরকে কেন স্বাধীনতা দেয়া হয় না? কেন তাকফিরের মাসআলা উঠানোই বা জিহাদের কথা বলাই অপরাধ?
* “ছাত্র তোমার মতো আল্লামা হলে ঠিক আছে তোমার রায় গ্রহণ করুক” এ উসূলটি কি শুধু জিহাদের মাসআলায়? না সব মাসআলায়? ধরুন ব্যাংকের কোনো মাসআলায় দুইজন আলেমের দ্বিমত হলো। একজন বলছেন জায়েয, অন্যজন বলছেন নাজায়েয। একজন তালিবুল ইলম উভয় আলেমের শাগরেদ। সে কোনটা গ্রহণ করবে? দুই উস্তাদের কোনো একটা গ্রহণ করার অধিকার তার আছে কি? না’কি যে উস্তাদের রায় গ্রহণ করতে চাইবে, আগে তাকে সে উস্তাদের মতো বড়

আল্লামা হতে হবে? এখানে তো কেউ বলবে না যে, এখন সে জায়েয নাজায়েয কোনোটাই গ্রহণ করতে পারবে না, আগে তাকে দুই উস্তাদের কোনে একজনের মতো আল্লামা হতে হবে, তারপর গ্রহণ করবে। জীবনের বহু মাসআলাতেই উস্তাদদের দ্বিমত হবে, তখন সে আল্লামা হওয়ার আগ পর্যন্ত চলবে কিভাবে? আর যারা সাধারণ মানুষ তারাই বা চলবে কিভাবে? অন্য সব মাসআলায় যদি একটা গ্রহণ করতে উস্তাদের সমান আল্লামা হতে না হয়, তাহলে জিহাদের মাসআলায় কেন এমন শর্ত? তাহলে কি আমরা জিহাদ বন্ধ করে দেয়ার পথে হাঁটছি?
* “ছাত্রদেরকে তার উস্তাদদের সাথে ছেড়ে দাও” কথাটা রাগের মাথায় হুজুর বলেছেন। হুজুর কি বলবেন যে, ফরিদ মাসউদের শাগরেদদেরকে ফরিদ মাসউদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক?
অনেক উস্তাদ আছে, যাদের না মাসআলার জ্ঞান আছে, না বাস্তব দুনিয়ার কিছু জ্ঞান আছে। গতানুগতিক কিতাব পড়া পড়ানোর বাইরে কিছু বুঝে না। এমনকি কোনো ইলমী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে গেলেও তারা বাধ সাধেন। হুজুর কি বলবেন, শাগরেদদেরকে এমন উস্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক?

উস্তাদদের মধ্যে কোনো মুনাফিক থাকা বা ইয়াহুদিদের মানস সন্তান মুহাররিফ এবং দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়াকামানেওয়ালা থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। শাগরেদদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার কথা হুজুর সমর্থন করবেন? আসলে এটা কোনো উসূলই না, এটা রাগের মাথার কথা।
* “যদি মুজতাহাদ ফিহ হয় তাহলে তুমি কে একবারে এই মুজতাহাদ ফি মাসআলার মধ্যে তুমি যে ইজতিহাদ গ্রহণ করলা সে ইজতিহাদ সব ছাত্রকে গিলিয়ে দিতে হবে, খাইয়ে দিতে হবে, মাদ্রাসার ইনতেজামিয়ার বিরুদ্ধে, উস্তাদদের বিরুদ্ধে?”
আমি কি আমারটা বলার অধিকার রাখি না? জিহাদের বিষয়টা শুধু কিতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকার মতো বিষয় না। আমলী ময়দানের বিষয়। আমি মনে করি এসব শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয। এরা দ্বীনের দুশমন। এদেরকে না সরালে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। আমি আমার মতের কথা কি কাউকে বলতে পারবো না যে, ভাই আমার এই মত, আপনি কি বলেন? এরপর সে আমার মত সমর্থন করতেও পারে, নাও করতে পারে। না করলে তার মতো সে চলবে, আমি আমার মতো চলবো। কিন্তু আমার অভিমত বলার কারণে আমাকে অপরাধী বলা হচ্ছে কেন? এটা কোন উসূল?

10
0

***

আসলে এখানে আরও কিছু কথা আছে। হুজুর তাকফিরের মাসআলাটা হাইলাইট করছেন। আমরা তাকফিরের মাসআলা আপাতত বাদ দিলাম। তাকফিরের মাসআলা বাদ দিলেই কি কিচ্ছা খতম? আরাকান, কাশ্মির, ভারত, আফগান, ইরাক, শাম, তুর্কিস্তান: পৃথিবীর অসংখ্য মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে এবং মুসলিমরা ফিলহাল কাফেরদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত। এই নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য আমার করণীয় কি? এদের জন্য কি জিহাদ করা জরুরী না? এই জিহাদের কথা কি আমি বলতে পারছি? এখানে কি সমস্যা? এটা বলতে গেলে কেন আমি অপরাধী? আমাদের এই শাসকগুলো শরীয়াহ কায়েমের পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শরীয়াহ কায়েম করছে না। আমি যদি বলি শরীয়াহর কথা, আমি হয়ে যাবো তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সবচে’ বড় বিদ্রোহী। সবচে’ বড় অপরাধী। আমার কোনো নিরাপত্তা নাই, নাই কোনো অধিকার। আমার জানমাল তাদের জন্য হালাল।
দুনিয়ার যত জায়গায় শরীয়াহর আওয়াজ উঠেছে, এই শাসকগোষ্ঠী তত জায়গায় মুসলিমদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাবত কুফফার বিশ্বের সাথে মিলে শরীয়াহ প্রত্যাশীদের

10
1

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে কিংবা করার চুক্তিতে আবদ্ধ।
দুনিয়ার যত জায়গায় মুসলিম নির্যাতিত, কোথাও আমি কিছু করতে পারছি না। প্রধান বাধা এই শাসকগোষ্ঠী।
এরা আমাকে সব ধরনের কুফর ও ফিসকের বেলায় সহায়তা দেবে। কুফরের দরজা, পাপাচারের দরজা এরা জাতির জন্য উন্মুক্ত করে দিবে। সর্ব প্রকারের সহযোগিতার দরজা তারা কাফের মুরতাদ বেঈমানদের জন্য খোলা রাখবে, কিন্তু আমি আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে নামায বাধ্যতামূলক করতে গেলেও তারা বাধা দিবে। তাকফিরের মাসআলা যদি হুজুর মুখতালাফ ফিহ মনে করেন, তাহলে তাতে দ্বিমত করতে পারেন; কিন্তু এই তাগুত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠানো, এদের বিরুদ্ধে জিহাদের আওয়াজ উঠানো কি শরীয়তে নাজায়েয? হুজুর কি কতয়িভাবে নাজায়েয বলতে পারবেন? কাফের হিসেবে হাতিয়ার উঠালাম না, অন্য সব দিক বিবেচনা করে উঠালে কি নাজায়ে হবে কতআন? আমার বোন আরাকানে, কাশ্মিরে, হিন্দে ধর্ষিত হতে থাকবে; আমি জিহাদে যেতে চাইলে তাগুত আমাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে আমার জান মাল হালাল ঘোষণা দেবে: এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠালে নাজায়েয হবে?

10
2

আসলে এসব শাসক কাফেরদের বাহিনি। কাফেররা মুসলিমদের নিপীড়ন করে, আর যাতে কোনো মুসলিম সাহায্যের জন্য যেতে না পারে সেজন্য এসব শাসককে খড়গ হাতে পাহারায় বসিয়ে দিয়েছে। আমি এদের খড়গ প্রতিহত করতে গেলে তাদের কাছে আমি হয়ে যাবো সন্ত্রাসী, আর উস্তাদের কাছে হয়ে যাবে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, জযবাতি। হায়রে বিচার!!
বেশির চেয়ে বেশি বলতে পারেন, এসব শাসকের হুকুম কি হবে তাতে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব কথা হুজুরদের সামনে উঠানোই যায় না। কোনো কথাই বলা যায় না। এরপরও অভিযোগ আমি আমার নিজের মত সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছি। বাস্তব কথা হলো, দলীল এবং বাস্তবতার তোয়াক্তা না করে ছাত্ররা গিলতে না চাইলেও উস্তাদরা জোর করে নিজেরা যা চান সবাইকে গিলাতে চান। এরপরও অভিযোগ শুধু আমার উপর। কারণ, আমি ছাত্র। আর তাগুতও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।
জাতিসংঘ যখন ইরাকের প্রতি অসন্তুষ্ট হল, তখন সাদ্দাম হয়ে গেল বেঈমান। যতদিন জাতিসংঘ সন্তুষ্ট ছিল ততদিন তার ঈমানে কোনো সমস্যা ছিল না!

10
3

আমেরিকা যখন কিছু বলেনি, তালেবান ছিল তখন মুজাহিদ। আমেরিকা নারাজ হতেই তালেবান হয়ে গেল সন্ত্রাসী।
আজ মুজাহিদরা জযবাতি, বেয়াদব, জাহেল, সাতহি। আল্লাহ তাআলা যখন মুজাহিদদের তামকিন দান করবেন, তখন ইনশাআল্লাহ অনেকের চোখ খোলে যাবে। তখন তারাই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান।

***

বক্তব্য ১৫ (দুয়েক কালিমা বাদে হুবহু নস): [আচ্ছা, এরপরে বলে দারুল হরব। সব দারুল হরব। ওরে আল্লারে! সব দারুল হরব! এক দেশ ছাড়া সব কি? দারুল হরব। আচ্ছা তো আবার এইটা কেন? এই দারুল হরবের মাসআলা কি মুজতাহাদ ফিহ না মানসুস আলাইহ? ওইটা যদি হয় মুজতাহাদ ফিহ এইটাও কি হবে? ওই কারণেই তো এইটাকে দারুল হরব বলে। আগের মাসআলার কারণেই তো দারুল হরব বলবে। ঐটা তো মুজতাহাদ ফিহ মাসআলা। … অথচ এটা এতো দাকিক এবং নাজুক মাসআলা!
এটাকে দারুল হরব নাম দিলেন আপনি, নাম দেয়ার পরে হুকুম কি? বলে দিলেন দারুল হরব, তার পরে করণীয় কি? ওইটা কি দিয়েছেন? করণীয়টা পেশ করেছেন? আপনি ঐ করণীয়টা করেছেন? আপনি নিজে করেছেন ঐ করণীয়টা?

10
4

এগুলোকে বলে শুযুয। লা -ইয়া ’নি। মিন হুসনি ইসলামিল মারয়ি ’ তরকুহু মা -লা-ইয়া ’নি। সূরাতান তাহকিক , সূরাতান ইলম , এমনে এগুলো ইলম না , এগুলো লা ইয়া ’নি। মহজ নেজা , মহজ জিদাল। ... মুজতাহাদ ফিহ হলে তুমি তোমার রায় সবার উপর মুসাল্লাত করতে পার না। অন্য কাউকে বলতে পারো না এরা জিহাদ বিরোধী। এরা হক বিরোধী। এরা ইলম বিরোধী। এরা গাফেল , মুদাহিন।] (মাগরিব বাদ বয়ান , ৩৮-৪০ মিনিট)

অভিব্যক্তি

মাসআলায় দ্বিমত হলেই জিহাদ বিরোধী , হক বিরোধী , ইলম বিরোধী , গাফেল, মুদাহিন বলে দেওয়া শরীয়তেও জায়েয নেই , মুজাহিদদের মানহাজেও তা নিষেধ। দুয়েক জনের ভুল আচরণ গোটা জামাতের উপর চাপানো ঠিক না।

আমি এখানে একজন মুজাহিদ শায়খের বিবৃতি উল্লেখ করছি। শায়খ আবু মুসআব উমাইর আল -আওলাক্বী রহ . বলেন,

قـد يقـول قائـل: إذا كنتم تقولـون يسـع الخلاف في التنزيـل فلمـاذا القاعـدة تشـنع على العلمـاء الـذين لا يكفرون الحكام؟ نقول: هذا سؤال جيـد ولابـد من بيانـه، فـأقول: إن القاعــدة لا تشـــنع على كــل من لم يكفـــر الحكام، فعنـدهم الـذين لا يكفـرون الحكـام من العلمـاء على قسمين:-

أ عالم بعيد عن سلطانهم، تجرد واجتهد ولم يصل إلى تكفيرهم، ولم يُستخدم كوسيلة لحرب المجاهدين، فهـذا يقدر عند القاعدة وله اجتهاده.

ب عالم لم يكفر الحكام واستُخدم لحرب المجاهـدين، ووصفهم بالفئـة الضـالة ومـدح الطـواغيت وخـذل الأمـة الإسلامية، فهذا الذي تحذر منه القاعدة؛ لأن ضرره على الأمة خطير. -لماذا اخترت القاعدة؟ ـ أبي مصعب محمد عمير الكلوي العولقي، ص: 46

"হয়তো কেউ আপত্তি উঠাতে পারে যে , আপনারা যখন বলে থাকেন , ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে , তখন যেসব আলেম শাসকদেরকে কাফের মনে করে না , আলকায়েদা তাদের সমালোচনা করে কেন ?

উত্তরে বলবো , এটি একটি সুন্দর প্রশ্ন। এটি স্পষ্ট করা জরুরী। আমি বলি , শাসকদেরকে কাফের বলে না এমন সকলেরই আলকায়েদা সমালোচনা করে না। যেসকল আলেম শাসকদেরকে কাফের মনে করে না , আলকায়েদার দৃষ্টিতে তারা দুইভাগে বিভক্ত :

১. এমন আলেম যিনি শাসকদের থেকে দূরে। ঐকান্তিক চেষ্টা গবেষণা সত্ত্বেও যার কাছে শাসকরা কাফের বলে মনে হলো না। তবে তাকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আলকায়েদা

তার কদর করে। তিনি তার নিজের ইজতিহাদ মতো চলবেন।
২. এমন আলেম যে শাসকদেরকে কাফের মনে করে না, তবে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদেরকে গোমরাহ ফেরকা বলে আখ্যায়িত করছে। তাগুতদের প্রশংসা করছে। প্রয়োজন মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করছে না। এই আলেমদের ব্যাপারেই আলকায়েদা সতর্ক করে থাকে। কেননা, উম্মতের জন্য তারা মারাত্নক ক্ষতিকর।” -লিমা যা ইখতারতুল কায়েদা: ৪৬
এ হল মুজাহিদদের মানহাজ। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে, সেটা মুজাহিদদের উপর চাপানো ঠিক হবে না।

***

দ্বিতীয়ত: দারুল হারব হওয়া না হওয়ার ব্যবধানে শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালে কোনো ব্যবধান আসবে না। এসব রাষ্ট্র দারুল হারব হলেও শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে, না হলেও করতে হবে। হ্যাঁ, জুযয়ি কিছু মাসআলায় ব্যবধান আসবে, সেটা ভিন্ন কথা।
তৃতীয়ত: দারুল হারবের মাসআলাটাকে হুজুর এত বেশি খতরনাক কেন ভাবছেন বুঝতে পারছি না। যতটুকু বুঝতে পারছি, দারুল হরব নাম দিলে বিশেষ একটা করণীয় চলে আসবে, সে

10
7

করণীয়টা করা অত সহজ হবে না মনে করছেন হুজুর। কিন্তু প্রশ্ন, বাস্তবে যদি দারুল হারব হয়ে থাকে, তাহলে শুধু নাম না দেয়ার কারণে কি হুকুমে ফরক হবে? করণীয়তে ফরক হবে? দারুল হারব হয়ে যাওয়ার পর আমি নাম দিলাম না দারুল হারব, তাই বলে কি করণীয় বদলে যাবে? করণীয় তো নামের সাথে সম্পৃক্ত না, করণীয় তো বাস্তবের সাথে সম্পৃক্ত- নাম যাই হোক। তাছাড়া করণীয় করতে পারবো না- এই ভয়ে কি হুকুম বয়ান করাও তরক করতে হবে?
যেমন ধরুন একটা লোক খতমে নবুওয়াতের আকিদা পরিত্যাগ করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী মেনে কাদিয়ানি হয়ে গেল। সে মুরতাদ। এ মত থেকে ফিরে না আসলে তাকে হত্যা করা জরুরী।
আমি তাকে এ মত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না বা তাকে হত্যা করতে পারবো না- তাই বলে কি আমি তাকে মুরতাদ আখ্যা দিতে পারবো না? সমাজে একজন মুসলিম হিসেবেই তাকে প্রকাশ করবো? কিংবা অন্য দশজন লোক তাকে মুসলিম বললে, তার সাথে বিবাহ শাদির মুআমালা করলে আমি কি চুপ করে থাকবো কিংবা সমর্থন করে যাব?
তাছাড়া মুজাহিদিনে কেরাম দারুল হারব বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, করণীয়টাও বলেছেন।

10
8

সে করণীয় সামনে রেখে কাজও করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।
সবচে’ বড় কথা হলো, দারুল হারব হয়ে গেলে বিশেষ কোনো করণীয় সামনে চলে আসবে, আর না হলে আসবে না- এমন না।
অনেকে মনে করেন, দারুল হারব হয়ে গেলে সেখান থেকে হিজরত করা জরুরী, অবস্থান করা নাজায়েয। হুজুর কি এমন কোনো মত পোষণ করেন কি’না জানি না। তবে বাস্তব হচ্ছে এ মাসআলা গলদ। মুজাহিদিনে কেরাম বলেন না যে, দারুল হারব হয়ে গেলে আর সেখানে থাকা জায়েয নেই। বরং মুজাহিদিনে কেরামের মানহাজ তো হলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূখণ্ডে থেকে সেখানে জিহাদ কায়েমের ফিকির করবে। একান্ত বিশেষ কোনো দরকারে কাউকে হিজরত করতে হলে শুধু সেই হিজরত করবে। অন্য সকলে নিজ নিজ ভূমিতে জিহাদ কায়েমের ফিকির করবে। দারুল হারব হয়ে গেলেই হিজরত করতে হবে এমন কথা মুজাহিদিনে কেরাম বলেন না। শরীয়তেরও এটি মাসআলা না। হাঁ, দারুল হারব থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে যাওয়ার সুযোগ থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। এ ধরনের ক্ষেত্রে চলে যাওয়াটা মু্স্তাহাব- যদি দারুল হারবে দ্বীন পালনের সুযোগ থাকে। সুযোগ না থাকলে হিজরত করা ওয়াজিব। সে ওয়াজিব মূলত দারুল হারব হওয়ার

10
9

কারণে না , দ্বীন পালন না করতে পারার কারণে। এ ধরনের হিজরত অনেক সময় দারুল ইসলামেও আবশ্যক হয়। যেমন দারুল ইসলামের কোনো এলাকা চরম বিদআতি কিংবা পাপাচারে ভরা। ঈমান আমল বাঁচানোই কষ্ট। এ ধরনের জায়গা থেকে ভাল জায়গায় হিজরত করা আবশ্যক।

অতএব, কোনো ভূমি দলীলের আলোকে দারুল হারব হয়ে গেলে , সেটা বয়ান করাই কাম্য। সে বয়ান করাটাও এক প্রকার করণীয়। এর বাহিরে আরও যেসব করণীয় আছে , সেগুলো শক্তি থাকলে ফিল হাল করবে , শক্তি না থাকলে শক্তি সঞ্চয় করবে। এটি লা -ইয়ানি ’ হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।

এখানে ইমাম জাসসাস রহ . (৩৭০ হি .) এর একটি বক্তব্য তুলে ধরা সমীচিন মনে করছি। বাতিনি ফেরকার হুকুম বয়ান করতে গিয়ে তিনি বলেন ,

وأما قوله عليه الصلاة والسلام ...: "قاتلوا من كفر بالله": فإنه يدل على وجوب قتال جميع أصناف الكفار وقتلهم، وأن أحدًا منهم لا يقر على ما هو عليه من الكفر إلا بالجزية ممن يجوز أخذ الجزية منهم، وإلا: فالإسلام أو السيف، كنحو من يعطي الإقرار بجملة التوحيد وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، وينقصه برد النصوص، مثل القرامطة المتسمية بالباطنية، فإن استحقاق القتل لا يزوال عنهم بزعمهم أنهم مقرون بجملة التوحيد والنبوة ... وكذلك أشباههم من سائر

الملحدين ... فأردنا أن نـبين حكمهم، لكي إن اتفـق في مسـتقبل الزمـان إمـام للمسـلمين يغضـب لـدين اللـه تعـالى، أن يتلاعب بـه الملحـدون، أو يسـعوا في إطفـاء نوره: أجرى عليهم حكم الله، وإن كان وجود ذلـك بعيـدًا في عصرنا، والله تعالى ولي دينه، وناصر شريعته.اهـ

"রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের □□□□-"قاتلوا من كفر بالله" 'যে আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী করেছে তার বিরুদ্ধে কিতাল কর', বুঝাচ্ছে যে, সব শ্রেণীর কাফেরের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং তাদেরকে কতল করা ফরয। তাদের কাউকেই তার কুফরের উপর বহাল রাখা যাবে না। যার থেকে জিযিয়া নেয়া জায়েয তার থেকে জিযিয়া নেয়া হবে। এছাড়া বাকিদের থেকে 'ইসলাম ও তরবারি' ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। যেমন যারা তাওহীদ এবং রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সত্যায়নের মৌখিক স্বীকৃতি তো দেয়, কিন্তু (শরীয়তের) নুসূসকে প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা তা ভঙ্গ করে। যেমন-'বাতিনিয়া' নামধারী 'কারামেত্বা'রা। শুধু তাওহীদ ও নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণেই তাদের থেকে তাদের প্রাপ্য হত্যার বিধান দূর হয়ে যাবে না। ... এ জাতীয় অন্য সকল মুলহিদের বিধানও এমনই। ... আমি এদের বিধান বর্ণনা করে যাওয়ার ইচ্ছা এ জন্য করেছি যে,

ভবিষ্যতে যদি মুসলমানদের এমন কোন ইমাম আসেন, যিনি মুলহিদদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে দেখে এবং তার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখে ফোঁসে উঠবেন: তাহলে তিনি যেন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করতে পারেন। যদিও আমাদের বর্তমান যমানায় এমন ইমাম পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের রক্ষক। তাঁর শরীয়তের হেফাজতকারী।” -শারহু মুখতাসারিত ত্বহাবী: ৭/৪১-৪৩
ফিলহাল বাতিনি কাফেরদের হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে আসবে মনে করে তিনি হুকুম বয়ান করে গেছেন। হাঁ, একটা ব্যাপার আছে যে, হক কথা সব জায়গায় বলা যায় না। মওকা বুঝে কথা বলতে হয়। এ হিসেবে দারুল হারব হয়ে গেলে সেটা বয়ান করা হবে কি হবে না তা মাসলাহাতের উপর নির্ভরশীল। এতে দ্বিমত হতে পারে। কেউ যদি মনে করেন, এখন না বলা মুনাসিব; তিনি বয়ান না করলেন। আর যাদের কাছে বলা মুনাসিব মনে হয় তারা বয়ান করবেন। একজনের ইজতিহাদ আরেকজনের উপর চাপানো তো ঠিক হবে না। মুজাহিদিনে কেরাম মনে করছেন বয়ান করলে ফায়েদা তাই বয়ান করছেন, করণীয়ও বলছেন। এটা

11
2

[illegible]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.